গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৮ বর্ষ ৪২ সংখ্যা ৭ - ১৩ জুলাই, ২০০৬ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

মূল্যবৃদ্ধির কোপে বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষ দুই সরকারই ঠুঁটো জগন্নাথ

মনমোহন সিংহ ১৯৯১ সালে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী হয়ে যখন ভারতবর্ষে উদার আর্থিক নীতি অর্থাৎ সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত আর্থিক নীতির সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন যে, দেশবাসী এই আর্থিক নীতির সুফল পাবেন পাঁচ বছর বাদে। তারপর কেটে গেছে ১৫টি বছর। ইতিমধ্যে তাঁর দেখানো পথে হেঁটেছে বিজেপি-তৃণমূল জোট সরকারও। এখন তিনি আর অর্থমন্ত্রী নন, একেবারে প্রধানমন্ত্রী। আমরা দেশবাসী এখন তাঁর উদার আর্থিক নীতির 'সুফল' হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। গম-ডাল-চিনি-মাছ-সব্জি সহ সমস্ত নিত্যপণ্যের বাজারে আগুন। এক কেজি মুগ ডাল ৪০-৪৫ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৫৫-৬০ টাকা, মুসুর ডাল ৩২ টাকা থেকে বেড়ে ৩৮/৪০ টাকা, বিউলির ডাল কেজিতে বেড়েছে ২০ টাকা, ছোলার ডাল ২৮ থেকে হয়েছে ৩৫ টাকা, আটা ১২-১৩ টাকা কেজি, চিনি ২২-২৩ টাকা। কিছু অর্থবান লোক বাদ দিলে এই অগ্নিমূল্যের বাজারে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ গরিব-মধ্যবিত্ত জনগণ বিপর্যস্ত। অথচ কেন্দ্রে একটি 'প্রগতিশীল' সরকার বসে আছে; রাজ্যে আছে কমিউনিস্ট নামধারী সিপিএমেরই মজবুত 'সপ্তম বামফ্রন্ট' সরকার। তবু নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে কী করে? কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার তো সিপিএমেরই সমর্থনে টিকে আছে। এ সরকার সিপিএম উঠতে বললে উঠবে, বসতে বললে বসবে — বলেছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। সেই সরকারকে চাপ দিয়ে এই মূল্যবৃদ্ধি প্রতিহত করার ব্যবস্থা তাঁরা করছেন না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর সিপিএম নেতাদের দিতে হবে।

চতুর্দিকে মূল্যবৃদ্ধিজনিত ক্ষোভ। হঠাৎ গত ২৬ জুন কেন্দ্রীয় সরকার যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠল। সংবাদপত্রে দেখা গেল — প্রধানমন্ত্রী 'উদ্বেগ' প্রকাশ করেছেন, 'মূল্যবৃদ্ধির পরিস্থিতি দৈনন্দিন ভিত্তিতে নজরদারি করার জন্য' তিনি ক্যাবিনেট সচিবকে 'বিশেষ দায়িত্ব'ও দিয়েছেন, এবং মূল্যবৃদ্ধির এই পরিস্থিতিতে কী করা যায় তা আলোচনার জন্য কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায়ও বসছেন। আর সেই সময় কংগ্রেসের এক মুখপাত্রও সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বলছেন, ''মূল্যবৃদ্ধি রোখার দায়িত্ব কেন্দ্রের যতটা, রাজ্য সরকার-গুলিরও ততটাই। তাই মূল্যবৃদ্ধির সব দায় কেন্দ্রের ঘাড়ে চাপিয়ে রাজ্য সরকারগুলি হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না। বরং রাজ্য সরকারগুলিও কড়া পদক্ষেপ নিক। কালোবাজারি, মজুতদারি ঠেকাক।'' (বর্তমান, ২৭-৬-০৬) ব্যস, জনগণের প্রতি কেন্দ্রের দায়িত্ব শেষ !

এবারে রাজ্য সরকারের ভূমিকা দেখা যাক। কংগ্রেস মূল্যবৃদ্ধিরোধের দায় অর্ধেক রাজ্য সরকারগুলির ঘাড়ে চাপানোর আগে পর্যন্ত সিপিএম মূল্যবৃদ্ধির প্রশ্নে ছিল নির্বিকার। সাধারণ মানুষ প্রতিদিন যখন ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির যন্ত্রণায় ভুগছে, তখনও সিপিএম নেতারা নীরব থেকেছেন। কৃষকদের কী কৌশলে জমি থেকে উচ্ছেদ করে সেই জমি সালিম ও টাটার মত পুঁজিপতি লুঠেরাদের হাতে তুলে দেওয়া যায় — তারই ছক কষেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী নিজে কৃষকদের উদ্দেশে বাণী বিতরণ করেছেন — টাটা ভাল লোক, তিনি গরিব সাধারণ মানুষের কথা ভাবেন, তিনি ঠকাবেন না, জমিচ্যুত কৃষকদের জন্য চাকরি-বাকরির ব্যবস্থা তিনি নিশ্চয় করবেন ইত্যাদি ইত্যাদি। যেই না কংগ্রেস বলটা রাজ্য সরকারগুলির কোর্টে ঠেলে দিল, অমনি সিপিএম নেতৃত্বের খেয়াল হল যে, মূল্যবৃদ্ধি বলে একটা বিষয় নিশ্চয় ঘটেছে। অবশ্য এটা ঠিক যে, সিপিএম নেতৃত্ব এখন তথাকথিত 'হাই সোসাইটি'র সঙ্গে এমন একাত্ম যে, সাধারণ মানুষ এমনকী তাঁদের দলের সাধারণ কর্মী-সমর্থকদের দৈনন্দিন জীবন-যন্ত্রণা অনুভবের ক্ষমতাও তাঁরা হারিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বিবৃতির খোঁচায় তাঁরা জেগে

ছয়ের পাতায় দেখুন

বাংলা বনধ

এস ইউ সি আই-এর বিরুদ্ধে মামলা খারিজ হয়ে গেল

২০০৪ সালের ১৭ নভেম্বর এস ইউ সি আই আহূত ২৪ ঘন্টার বাংলা বনধ্‌কে বেআইনি ঘোষণা করার দাবিতে বনধের আগেই জনৈক ইদ্রিস আলির উদ্যোগে এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ সম্পর্কিত মামলা দায়ের করা হয়েছিল। গত ১৬ জুন, ২০০৬ মাননীয় বিচারপতি প্রতাপ রায় ও মাননীয় বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য সেই মামলা খারিজ করে দিয়েছেন। এই মামলায় রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের পক্ষে সওয়াল করেছেন বিশিষ্ট আইনজীবী পার্থসারথি সেনগুপ্ত।

পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যুতের বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহার সহ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে এ'রাজ্যের শ্রমিক-চাষী-সাধারণ মানুষের প্রবল ক্ষোভের অভিব্যক্তি ঘটেছিল এস ইউ সি আই-এর এই বাংলা বনধ্‌ আহ্বানের মধ্য দিয়ে। বনধের আহ্বান জানাতেই তা ব্যাপক জনগণের মধ্যে সমর্থনসূচক প্রবল আলোড়ন তুলেছিল, যা বুঝেই ওই বনধ্‌ বানচাল করার জন্য সিপিএম, তাদের সরকার ও নানা মহল তৎপর হয়ে ওঠে।

সিপিএম-এর পক্ষ থেকে হুমকি, ভীতি প্রদর্শন

ছয়ের পাতায় দেখুন

সিঙ্গুর ঃ কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারকে চাষীরা বললেন

রক্ত দেব, প্রাণ দেব, জমি দেব না

সিঙ্গুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটির আহ্বানে ৩০ জুন এস ইউ সি আই পরিষদীয় নেতা বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল সিঙ্গুর পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড সেখ খোদাবক্স, কৃষক নেতা কমরেড দাউদ গাজী, এস ইউ সি আই দলের হুগলি জেলা সম্পাদক কমরেড পরিমল সেন প্রমুখ। তাঁরা দেখলেন, টাটা কোম্পানিকে মোটরগাড়ি কারখানা করার জমি দেওয়াকে কেন্দ্র করে সিপিএম কীরকম মিথ্যাচার করছে। ওরা বলছে, ওইসব জমি জলাজমি, সারা বছর ভাল করে চাষ-আবাদ হয় না। ফলে টাটাকে চাষীরা জমি দিলে তাদের তো উপকার হবেই, এলাকারও উন্নয়ন হবে। সর্বোপরি বেশিরভাগ চাষী নাকি তাঁদের জমির দলিল ওইসব নেতাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। কিন্তু চাষীরা এই মিথ্যাপ্রচার ও নানা মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে বিভ্রান্ত নন। তাঁরা দুপুরের চড়া রোদ উপেক্ষা করে প্রতিনিধি দলকে চাষের জমি পরিদর্শন করান। সেখানে প্রতিনিধি দল বাস্তবে লক্ষ্য করেন, দুর্গাপুর এক্সপ্রেস রোডের ধারে ওই সমস্ত মাঠ শুধু সবুজ আর সবুজ — কী চাষ নেই সেখানে ! কোনও জমিতে দশ-বারো ফুট লম্বা পাট চাষ তো তার পাশেই ঢেঁড়স, বরবটি, পটল, ঝিঙে ; আবার কোন জমির তিল সবেমাত্র ঘরে তুলেই, আবার আমন ধানের বীজতলা ফেলা হয়েছে। চাষীরা বলেন, আমরা সারা বছর চাষ করি, আমাদের জমি একটি দিনও অনাবাদী পড়ে থাকে না। কেন পড়ে থাকবে ? আমাদের মাঠে সেচের জন্য আছে চারটি ডিপ টিউবওয়েল, স্যালো ২৭টি। এছাড়া মাঠের দু'পাশ দিয়ে বয়ে গেছে দামোদর সেচ প্রকল্পের দুটি ক্যানেল।

জমি পরিদর্শনের ফাঁকে ফাঁকেই 'কৃষিজমি রক্ষা কমিটি'র পক্ষ থেকে গোপালনগর সাহানাপাড়া, গোপালনগর মধ্যপাড়া, শিবতলা প্রাঙ্গণ, গোপালনগর বাজেমেলিয়া নিউ উজ্জ্বল সংঘ প্রাঙ্গণ,

আটের পাতায় দেখুন

সিঙ্গুরের গ্রামে গ্রামে জমি রক্ষার লড়াইয়ে মিছিল, সভা। বক্তব্য রাখছেন বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার।

১২২টি ট্রেনিং কলেজ বেআইনি ঘোষিত

শিক্ষার্থীরা চরম বিপদে

রাজ্য সরকারের ভ্রান্ত নীতির কারণে বিভিন্ন সময়ে এ রাজ্যের শিক্ষা ও শিক্ষকের উপর ভয়াবহ আক্রমণ নেমে এসেছে। তারই আর এক প্রতিফলন দেখা গেল ১২২টি প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রের হাজার হাজার শিক্ষার্থীর জীবনে। লক্ষাধিক টাকা খরচ করে সরকারি এবং সরকার অনুমোদিত ট্রেনিং কলেজগুলিতে যাঁরা সারা বছর পড়াশুনা করলেন — অন্তিম সময়ে এসে তাঁরা জানতে পারলেন যে, তাঁরা ফাইনাল পরীক্ষা দিতে পারবেন না, এবং এই সমস্ত ট্রেনিং সেন্টারগুলি থেকে যাঁরা পাশ করেছেনও তাঁদের সার্টিফিকেটও অবৈধ। উপযুক্ত পরিকাঠামো না থাকা সত্ত্বেও বহু বেসরকারি ট্রেনিং কলেজকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল, যেগুলির মধ্যে অনেক কলেজ সম্পর্কে হাইকোর্ট প্রশ্ন তুলেছিল। পরবর্তীকালে দেখা গেল — বেসরকারি কলেজগুলির সঙ্গে সরাসরি সরকার পরিচালিত বেশ কিছু ট্রেনিং কলেজও অবৈধ — কারণ এরা কেন্দ্রীয় সংস্থা এনসিটিই'র অনুমোদন নেয়নি। এমনকী এনসিটিই'র তরফে বারংবার সতর্ক করা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার কর্ণপাত না করায় আজ প্রায় এক লক্ষ শিক্ষার্থীর জীবনে নেমে এসেছে চরম অনিশ্চয়তা।

রাজ্য সরকারের ভ্রান্ত জনস্বার্থবিরোধী নীতির ফলে রাজ্যের ১৪২টি প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে ১২২টি বেআইনি বলে ঘোষিত। এর ফলে বর্তমান শিক্ষাবর্ষের ২০ হাজার ছাত্রছাত্রী সহ প্রায় এক লক্ষ শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত। এর বিরুদ্ধে বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে ২৮ জুন শত শত শিক্ষক-শিক্ষিকা কলকাতায় বিক্ষোভ সমাবেশ করেন এবং বিক্ষোভ মিছিল করে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকলিপি পেশ করেন।

বিভিন্ন জেলা থেকে আগত শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে সমবেত হন। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সমিতির সাধারণ সম্পাদক কার্তিক সাহা বলেন — এই অবস্থা সৃষ্টির জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী রাজ্য সরকার। তারাই আবার হঠাৎ করে বর্তমান শিক্ষাবর্ষের ফাইনাল পরীক্ষাও বন্ধ করে দিয়েছে। তাদের বেআইনি ও অন্যায় কাজের বলি হচ্ছেন হাজার হাজার শিক্ষার্থী। তিনি অবিলম্বে সরকারকে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। অন্যথায় রাজ্যব্যাপী উত্তাল আন্দোলন সৃষ্টি হবে বলে তিনি ঘোষণা করেন। সমাবেশে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ভাষণ দেন। এর মধ্যে ছিলেন অজিত হোড়, তপতী মিত্র, আব্দুস সালাম, সতীশ সাউ, স্বপন গরাই, কার্তিক হাজরা প্রমুখ।

এরপর মিছিল যায় রানি রাসমণি রোডে। সেখান থেকে প্রতিনিধিদল মহাকরণে গিয়ে স্মারকলিপি পেশ করেন। সমাবেশ থেকে জানানো হয়, এই সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সভাপতি শূলপাণি ভট্টাচার্য, বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দে মহাশয়কে বার বার জানানো সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি। তাই বাধ্য হয়ে শিক্ষকসমাজকে পথে নামতে হয়েছে। পরবর্তী ধাপে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ আন্দোলন হবে। এছাড়া ৫ জুলাই শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দে'র কাছেও ডেপুটেশন দেওয়া হবে।

পরিচারিকাদের শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি, নির্দিষ্ট বেতন, সপ্তাহে একদিন ছুটি এবং বিপিএল তালিকাভুক্তির দাবিতে সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ইউনিটের উদ্যোগে ২১ জুন রঘুনাথপুর বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কমরেডস্ অনিতা মাহাতো, শোভা মাহাতো, চুলবুলি বাউরি, নমিতা বাউরি। বিডিও বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনার প্রতিশ্রুতি দেন।

বিএড এবং প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ সমস্যার সমাধান সরকারকেই করতে হবে

বিএড এবং প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির সমস্যা সম্পর্কে রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির নিন্দা করে এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ এক বিবৃতিতে বলেন —

সম্প্রতি হাইকোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিএড এবং প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ পাঠরত হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে যে দুর্দশার মধ্যে পড়তে হয়েছে, তা রাজ্য সরকারের উদাসীনতা, অদূরদর্শিতা এবং শিক্ষার প্রতি চরম অমানবিক ও ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। রাজ্য সরকার বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ার তাগিদেই এন সি টি ই (ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ টিচারস এডুকেশন)-এর শর্তাবলী এতদিন ধরে উপেক্ষা করে এসেছে ও দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষার বেসরকারীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ করার পক্ষে ঢালাওভাবে পরিকাঠামোহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়াতে অনুমোদন দিয়ে এসেছে। এর পরিণতিতেই এইসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা চরম দুর্গতির মধ্যে পড়েছেন। এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব বর্তায় রাজ্য সরকারের উপর। আজ এই সমস্যা সম্পর্কে রাজ্য সরকারের নীরবতা ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষানুরাগী মানুষের কাছে বিস্ময়কর।

যে সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার সরকারি মেডিক্যাল কলেজে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের বঞ্চিত করে এন আর আই কোটার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে মুষ্টিমেয় ধনীর সন্তানদের ভর্তির সুযোগ করে দিয়েছিল এবং সেই সুযোগ কোর্টের রায়ে খারিজ হওয়ার পরেও সুপ্রিমকোর্ট পর্যন্ত আইনি লড়াই করে পরাজিত হয়ে, পরে মানবিক কারণ দেখিয়ে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করে দিয়েছিল, আজ সেই সরকার হাজার হাজার সাধারণ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে কোন বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে না, কারণ তারা আজ সাধারণ ছাত্রস্বার্থ দেখছে না।

আমরা সিপিএম পরিচালিত এই সরকারের জনস্বার্থবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির তীব্র নিন্দা করছি এবং এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ইতিপূর্বে যাঁরা পাশ করেছেন এবং বর্তমানে যাঁরা পাঠরত তাঁদের যেন কোন ক্ষতি না হয় তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছি।

আন্দোলনের চাপে বাস চলাচল শুরু মেছেদায়

প্রায় ১০ মাস বন্ধ থাকার পর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অতি গুরুত্বপূর্ণ হলদিয়া-খুকুড়দহ রুটে বাস চলাচল শুরু হল। ২০০৫ সালের আগস্ট মাস থেকে এই রুটে সন্ধ্যা ৭টার পর আর কোন বাস না থাকায় দেউলিয়া-বরদাবাড়-জিএগ্রাদা-সিদ্ধা-ধুলিয়াড়া-মেচগ্রাম-কেশাপাট-পীতপুর-জিএগ্রাখালি-যশোড়া প্রভৃতি বাসস্টপ এলাকার যাত্রীরা প্রচণ্ড দুর্ভোগের মধ্যে পড়েন। ফলস্বরূপ এলাকার যাত্রীসাধারণ দেউলিয়া-মেচগ্রাম পরিবহন যাত্রী কমিটি গঠন করে আন্দোলন শুরু করেন। ডেপুটেশন-বিক্ষোভ ছাড়াও যাত্রীরা গত ১২ জুন ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। কিন্তু তাতে কোন ফল না হওয়ায় ঐ কমিটি ফের ২২ জুন বোম্বাই রোড অবরোধের কর্মসূচি নেন। সড়ক অবরোধের ঐ কর্মসূচির কথা জেলাশাসক, জেলা পরিবহন আধিকারিক, মহকুমা শাসক (তমলুক), পুলিশ সুপার প্রভৃতি আধিকারিকদের জানিয়ে দেওয়া হলে জেলা প্রশাসনের টনক নড়ে। জেলা পরিবহন আধিকারিক দুই বাস মালিক সমিতির সাথে বসে গত ১৯ জুন থেকে ঐ রুটে রাতে বাস চালানোর ব্যবস্থা করেন। সেইমত রাত্রি ৮-১০ মিনিট ও ৯টায় আপাতত দুটি হলদিয়া-খুকুড়দহ বাস চালু হয়েছে।

দেউলিয়া-মেচগ্রাম পরিবহন যাত্রী কমিটির সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে 'হলদিয়া-কালিদান', 'নন্দীগ্রাম-মেচগ্রাম' প্রভৃতি বাসগুলির জাতীয় সড়কে যাতায়াত, 'হলদিয়া-গোপীগঞ্জ' বাসের সময়সূচি অনুযায়ী রাত্রি ৮-১৫ মিনিটে মেছেদা স্টেশন থেকে ছাড়া প্রভৃতি দাবিও জানিয়েছেন।

কোচবিহার

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে সোচ্চার নাগরিক অধিকার রক্ষা কমিটি

কোচবিহার শহরের প্রাণকেন্দ্র সাগরদীঘির পাশেই শহীদ ক্ষুদিরাম মূর্তি। তাঁরই নামাঙ্কিত রাস্তা ক্ষুদিরাম সরণী সংস্কারের দাবিতে নাগরিক অধিকার রক্ষা কমিটি এলাকার বাসিন্দাদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে। এরপর ১৪ জুন কমিটির পক্ষ থেকে পূর্ত বিভাগের সহকারী বাস্তুকারকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন কমিটির চেয়ারম্যান কুমার ত্রিকুলেন্দ্র নারায়ণ, তপনকুমার ভট্টাচার্য, প্রাণেশ কুমার চক্রবর্তী ও নেপাল মিত্র প্রমুখ।

কমসোমলের উদ্যোগে পাঠ্যপুস্তক দান ও রবীন্দ্র-নজরুল স্মরণ অনুষ্ঠান নোনাকুড়িতে

পূর্ব মেদিনীপুরে শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লকের নোনাকুড়িতে গত ৩ জুন বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে ৫৫ জন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীকে পাঠ্যপুস্তক প্রদান ও রবীন্দ্র-নজরুল স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কমসোমল পরিচালিত নোনাকুড়ি বিদ্যাসাগর কিশোর গ্রন্থাগারের সদস্যরা। রবীন্দ্র-নজরুল চর্চার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য নিয়ে মূল আলোচনা করেন অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা এস ইউ সি আই-এর জেলা কমিটির সদস্য কমরেড তপন ভৌমিক। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ছাত্র সংগঠন ডি এস ও'র জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত দাস ও গ্রন্থাগারের অন্যতম পরিচালক কমরেড সবিতা সামন্ত। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গ্রন্থাগারের অন্যতম উপদেষ্টা এবং মেছেদা বিদ্যাসাগর গ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্রের অন্যতম কর্ণধার, বিশিষ্ট সমাজসেবী, শিক্ষক হীরেন্দ্রনাথ জানা। কমসোমলের কিশোর-কিশোরীরা গান ও আবৃত্তি পরিবেশন করে।

এই অনুষ্ঠানের পরিচালক ও কমসোমলের জেলা ইনচার্জ কমরেড অরুণ জানা জানান, ইতিপূর্বে গরিব ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক দান, দুঃস্থ মানুষদের শীতবস্ত্র দানসহ বিভিন্ন ধরনের সমাজসেবামূলক কর্মসূচি পালিত হয়েছে। এছাড়াও কমসোমলের উদ্যোগে এলাকার দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি ফ্রি-কোচিং সেন্টার পাঁচ বছর ধরে চলছে বলে তিনি জানান।

আন্তর্জাতিক শ্রমআইন মানা দূরের কথা, জাতীয় শ্রমআইনগুলিই লঙিঘত হচ্ছে

৯৫তম আন্তর্জাতিক শ্রমসম্মেলনে ইউটিইউসি-লেনিন সরণী

গত ৩০ মে থেকে ১৬ জুন জেনেভায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আই এল ও'র ৯৫তম আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলন। এই সম্মেলনে পৃথিবীর ১৭৮টি দেশের শ্রমিক, মালিক ও সরকার পক্ষের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। ভারতবর্ষ থেকে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী, সিটু, এ আই টি ইউ সি, আই এন টি ইউ সি, এইচ এম এস, বি এম এস প্রমুখ ৬টি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন অংশগ্রহণ করে। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র পক্ষ থেকে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রমিক প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন। এই সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে একাধিক কমিটি গঠন করা হয়, যার অন্যতম হল আই এল ও অনুমোদিত আন্তর্জাতিক শ্রম আইনের যথাযথ প্রয়োগ — অর্থাৎ শিশুশ্রমিক, কাজের ঘণ্টা, দাসশ্রমিক, ন্যূনতম মজুরি, মহিলা শ্রমিকদের প্রাপ্য সুযোগসুবিধা সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে আই এল ও অনুমোদিত স্বীকৃত রীতিনীতির (conventions) প্রয়োগ; শ্রমদপ্তর কর্তৃক অনুসন্ধান এবং কনভেনশন লঙঘনকারী দেশগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ নিয়ে ত্রিপাক্ষিক আলোচনা সংক্রান্ত কমিটি। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কমিটিতে ভারতবর্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন কমরেড শঙ্কর সাহা। মূল অধিবেশন ছাড়াও উপরোক্ত কমিটির একাধিক সভায় তিনি মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

কমরেড শঙ্কর সাহা শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, বর্তমানে সারা পৃথিবীতেই আইনের প্রয়োগ অপেক্ষা লঙঘনের প্রবণতা ক্রমাগত বাড়ছে। বিশ্বায়নের ফলে একদিকে সারা পৃথিবীতেই বেকারত্ব, দারিদ্র্য, অনাহার, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব ও অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে, পাশাপাশি মালিকশ্রেণীর মুনাফা হচ্ছে ক্রমাগত ঊর্ধ্বগামী। ব্যাপকহারে বাড়ছে আউটসোর্সিং। পরিণামে কর্মীদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা দিন দিন সঙ্কুচিত হচ্ছে এবং এই কাজ, বিশ্বজুড়ে বিচরণশীল চলমান পুঁজির ভুবনীকরণ নীতি অনুযায়ী বেশি হচ্ছে তুলনায় দরিদ্র দেশগুলির সস্তা শ্রমশক্তি ও কাঁচামাল লুঠ করে।

তিনি বলেন, একথা দুঃখের হলেও সত্য যে, আই এল ও কর্তৃক দক্ষ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশগুলি শুধুমাত্র আই এল ও'র সদস্যভুক্ত সেই সমস্ত দেশেই সীমাবদ্ধ থাকছে, যারা নিজ নিজ দেশে এগুলি অনুমোদন করেছে। কিন্তু ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে বহু দেশ কমিটির নজর এড়িয়ে গেছে যারা নিজ নিজ দেশে সুপারিশগুলি এখনও অনুমোদন করেনি। বাস্তবিকপক্ষে, বহু দেশ এখন ভাবছে, আই এল ও'র কনভেনশনগুলির অনুমোদন থেকে মুক্ত হতে পারলে বাড়তি অনেক দায়বদ্ধতা থেকে তারা রেহাই পেতে পারত। এই উদ্দেশ্যেই বিধিবদ্ধ ক্ষেত্রগুলির বিধিবহির্ভূত ক্ষেত্রে পরিণত হওয়া বর্তমানে একটি স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এইভাবেই পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের শ্রমজীবী মানুষ তাদের আইনি অধিকারগুলো হারাচ্ছে। তিনি বলেন যে, বিভিন্ন দেশের নানা ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মীর অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য আই এল ও'র আন্তর্জাতিক শ্রমবিধান সঠিক পথ ও উপায় খুঁজে বার করতে যদি সক্ষম হয়ও, সর্বোচ্চ মুনাফার উদ্দেশ্যে পরিচালিত উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন করে সাধারণ মানুষের প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে পরিচালিত উৎপাদন ব্যবস্থার প্রবর্তন ব্যতিরেকে বেকার সমস্যার চিরস্থায়ী সমাধান, শিশুশ্রমিক নিয়োগ বন্ধ প্রভৃতি আই এল ও'র বিধানগুলির বাস্তবায়ন কখনই সম্ভব নয়।

শ্রমদপ্তরের পর্যবেক্ষণ নিয়ে কমরেড সাহা বলেন যে, বিলগ্নীকরণ, বেসরকারীকরণ, ঠিকা ও চুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থার নতুন রূপ আউটসোর্সিং প্রবর্তন ও ক্রমবর্ধমান লিঙ্গ বৈষম্যের বর্তমান সময়ে শ্রমদপ্তরের পর্যবেক্ষণ অনেক বেশি জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে। সরকার ও মালিকদের পক্ষ থেকে শ্রমআইনকে মালিকশ্রেণীর স্বার্থে এমনভাবে পরিবর্তিত করা হচ্ছে, যার ফলে এই সমাজের সমস্ত সম্পদের স্রষ্টা শ্রমিকশ্রেণী রাষ্ট্রের কাছ থেকে ন্যূনতম নিরাপত্তা পাচ্ছে না। বহু ক্ষেত্রে কর্মীদের কাজ করিয়ে বেতন দেওয়া হচ্ছে না। এমতাবস্থায় বর্তমান শ্রমআইনের কঠোর প্রয়োগ ঠিকমত হচ্ছে কি না, তা দেখার জন্য শ্রমদপ্তরের কার্যকরী পর্যবেক্ষণ এবং শ্রমআইন ভঙ্গকারীদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। শ্রমদপ্তরের পক্ষ থেকে শ্রমআইনের প্রয়োগ পর্যবেক্ষণের জন্য বিধিবদ্ধ ও বিধিহীন উভয় ক্ষেত্রেই যথাযথ অনুসন্ধান জরুরি। শুধু তাই নয়, উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলি ছাড়াও স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, কাজের পরিবেশ, সামাজিক নিরাপত্তা, যৌথচুক্তির যথাযথ প্রয়োগ প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলিতেও নজরদারি খুব গুরুত্ব দিয়ে করা দরকার।

সম্মেলনে কমরেড শংকর সাহা

মহিলা শ্রমিকদের প্রসঙ্গে কমরেড শঙ্কর সাহা বলেন, এঁরা ধারাবাহিক বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। কাজে নিয়োগের ক্ষেত্রে শুধু নয়, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে চাকরিতে যোগ দেওয়ার সময় মহিলারা গর্ভবতী কিনা, তার পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। এই ধরনের শিল্পক্ষেত্রে মাতৃত্বকালীন ছুটিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থেকে মহিলাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে এবং ঝুঁকিবহুল কষ্টসাধ্য পরিবেশে জবরদস্তি কাজ করানো হচ্ছে, যাতে তাঁরা কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, মহিলাদের প্রতি এই বৈষম্য ও অবমাননা বন্ধ হবে না, যতদিন পর্যন্ত নারীত্বের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করে সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ না হবে।

শিল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে অগ্রণী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বিশেষ একটি আলোচনায় তিনি বলেন যে, প্রতি বৎসর প্রায় ৫০,০০০ মহিলা ও শিশু দক্ষিণপূর্ব এশিয়া থেকে আমেরিকায় বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, যাদের যৌনব্যবসা, ঘরের পরিচারিকা ও কৃষিকাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এদের অনেক কম মজুরিতে কাজ করানো হচ্ছে শুধু নয়, এর উপর বহুক্ষেত্রেই তাদের ১২ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে কাজ করানো হচ্ছে। বেআইনি হওয়া সত্ত্বেও মালিকরা এগুলি করতে পারছে, কারণ এগুলি বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সদিচ্ছা সরকারগুলির নেই।

প্লেনারি অধিবেশনে বক্তব্য

১৬ জুন প্লেনারি অধিবেশনে উত্থাপিত রিপোর্টের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে কমরেড সাহা উপস্থিত ১৭৮টি দেশের প্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, ভারতবর্ষের শ্রমজীবী জনগণ আই এল ও'র অনুমোদিত কনভেনশন, বিশেষ করে মৌলিক কনভেনশনগুলি বাস্তবায়িত করার জন্য সংগ্রাম করার পাশাপাশি একই দাবিতে বিশ্বের অন্যান্য দেশে আন্দোলনরত শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রামের প্রতি সংহতি জানাচ্ছে।

আই এল ও অনুমোদিত কনভেনশনগুলি রূপায়ণের প্রশ্নে বিচ্যুত বা লঙঘনকারী দেশগুলির বিরুদ্ধে আই এল ও কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ নিয়ে গৃহীত কার্যক্রম প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত শিশুশ্রমিক থেকে বার্মায় নিযুক্ত বেগার শ্রমিক (ফোর্সড লেবার) সমস্ত ক্ষেত্রেই আই এল ও'র কনভেনশন লঙিঘত হচ্ছে শুধু নয়, সারা পৃথিবীতে আজ হয়তো এমন দেশ পাওয়া যাবে না, যে দাবি করতে পারে সে দেশে বেকারত্ববৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান কর্মচ্যুতি, সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদির অবলুপ্তি, কাজের অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি, স্থায়ী কাজে ঠিকা ও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, আউটসোর্সিং প্রবর্তন, কর্মীসঙ্কোচন, কাজের বোঝাবৃদ্ধি, বেসরকারীকরণ প্রভৃতি শ্রমিকবিরোধী কার্যক্রম চলছে না। পুঁজিপতিশ্রেণী তাদের সর্বোচ্চ মুনাফাকে সুনিশ্চিত করার জন্য অনুন্নত দেশগুলির সস্তা শ্রমশক্তি ও কাঁচামাল দু'হাত ভরে লুঠ করছে, ফলে বর্তমানে একমেরু বিশ্বে সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে উপরোক্ত ঘটনাগুলি নিত্যদিনের সাধারণ ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে। অনুন্নত দেশগুলির জাতীয় সরকার দেশীয় পুঁজিপতিদের স্বার্থে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে নিজ নিজ দেশে বহুজাতিক কোম্পানিগুলিকে লগ্নির জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছে এবং তাদের শর্ত মেনে ঐ সমস্ত দেশে এ যাবৎ বলবৎ শ্রমআইনগুলিকে মালিকশ্রেণীর স্বার্থে বাতিল করছে। এক্ষেত্রে জাতীয় সরকারগুলি একচেটিয়া পুঁজির অনুগত দাস হিসাবে তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য শ্রমজীবী জনগণকে ''দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে'' ত্যাগ স্বীকারের মধ্য দিয়ে ''দেশের স্বার্থে'' তাদের অর্জিত অধিকারগুলি বিসর্জন দেওয়ার পাঠ দিচ্ছে এবং এইভাবেই তারা জাতীয় পুঁজিপতিদের অন্য দেশের পুঁজিপতিদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠার পথ প্রশস্ত করছে। সেজন্য বর্তমান পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক শ্রম আইন নিয়ে কথা বলা অর্থহীন, কারণ জাতীয় শ্রম আইনগুলিই এখন হয় অবলুপ্ত হচ্ছে, অথবা কাজ করছে না।

তিনি বলেন, বিশ্ব পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বর্তমানে সঙ্কটের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। এই অবস্থায় আমরা দেখতে পাচ্ছি, দেশে দেশে পুঁজিবাদী শাসকগোষ্ঠী তাদের শোষণের মাত্রাকে যেমন ক্রমাগত আরও তীব্র করছে, অন্যদিকে শ্রমিকদের বহু সংগ্রামের দ্বারা অর্জিত অধিকারগুলিকে বহুল পরিমাণে ইতিমধ্যেই কেড়ে নিয়েছে এবং যতটুকু অবশিষ্ট আছে তাও কেড়ে নিতে সর্বাত্মক আক্রমণ চালাচ্ছে। কার্যত পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখে আন্তর্জাতিক শ্রমবিধানগুলো কার্যকর করাই আজ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় মালিকশ্রেণীর সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করে শ্রমিকের অধিকারগুলিকে পুনরুদ্ধার, রক্ষা ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে দেশে দেশে শ্রমিকশ্রেণীকে আরও সচেতন, আরও ঐক্যবদ্ধ, আরও সুসংগঠিত ও আন্দোলনগুলিকে ক্রমাগত আরও তীব্র করতে হবে। সাথে সাথে এই আন্দোলনগুলিকে সর্বোচ্চ মুনাফার লক্ষ্যে পরিচালিত বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটিয়ে সমাজের সমস্ত মানুষের প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যে পরিচালিত সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পরিপূরক করে গড়ে তুলতে হবে।

তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্বে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবসরকালীন সুযোগসুবিধা সবই আছে, কিন্তু এগুলি আজ বাজারের পণ্য হিসাবে বিক্রি হচ্ছে গরিবদের নিঃশেষিত করে পুঁজিপতিদের সর্বোচ্চ মুনাফাকে সুনিশ্চিত করার জন্য। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, একদা জনকল্যাণমুখী বলে পরিচিত রাষ্ট্রগুলি বর্তমানে সমাজের দরিদ্রতম অংশের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্বও বহন করছে না এবং এই সমস্ত রাষ্ট্রগুলি জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য, জনগণেরই রাষ্ট্র হওয়ার বদলে বর্তমানে খোলাখুলি পুঁজিপতিদের দ্বারা, পুঁজিপতিদের জন্য, পুঁজিপতিদেরই রাষ্ট্র এই রূপ পরিগ্রহ করেছে।

কমরেড সাহা বলেন, আমরা দেখেছি ২৫টি দেশের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের প্রাপ্য সুযোগসুবিধা কীভাবে লঙিঘত হচ্ছে এবং এরকম আরও বহু দেশ আছে, যাদের চিহ্নিতকরণ এই অধিবেশন এখনও করতে পারেনি। উপস্থিত প্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, প্রতি বৎসর হাজার হাজার মহিলা ও শিশুকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাচার করে শুধু দেহব্যবসা ও যৌনকার্যেই ব্যবহার করা হচ্ছে না — ক্যালিফোর্নিয়া, ফ্লোরিডা, নিউইয়র্ক প্রভৃতি স্থানে অনুপযুক্ত বেতনে এদের কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে এবং লক্ষ লক্ষ শিশুশ্রমিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিশিল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে, যাদের অনেকেই ভয়ঙ্কর কীটনাশক ওষুধ ব্যবহারজনিত কারণে ক্যান্সার সহ মস্তিষ্কের নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

পরিশেষে কমরেড সাহা উল্লেখ করেন যে, একটি যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন আজ সভ্য দুনিয়ার মানুষের মনে সঙ্গত কারণেই ধাক্কা দিচ্ছে, তা হল, মহাশক্তিধর মার্কিন প্রশাসন ১০,০০০ কিলোমিটার দূরে শত্রুপক্ষের রান্নাঘরে মিসাইল দিয়ে আঘাত করতে সক্ষম হলেও কেন তারা মহিলা ও শিশুশ্রমিকদের নিয়ে ব্যবসাকারীদের এবং নিজের দেশের অভ্যন্তরে কৃষিশিল্পে শিশুশ্রমিক নিয়োগকারীদের চিহ্নিত করে শাস্তি দিতে পারছে না? উপস্থিত প্রতিনিধিরা প্রবল করতালির মধ্য দিয়ে কমরেড সাহার বক্তব্যের প্রতি তাঁদের সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

কমরেড শঙ্কর সাহা ছাড়া প্লেনারিতে শিল্পে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন এ আই টি ইউ সি'র কমরেড মহাদেবন, শিশুশ্রমিকদের উপর বক্তব্য রাখেন সিটু'র জাতীয় সম্পাদক কমরেড স্বদেশ দেবরায় এবং মূল রিপোর্টের উপর বক্তব্য রাখেন বি এম এসের শ্রী দাভে এবং সম্মেলনের সহ সভাপতি হিসাবে বক্তব্য রাখেন আই এন টি ইউ সি'র এন এম আদ্যন্ত।

জেনেভা সম্মেলন

স্কুলে যৌনশিক্ষা ঃ প্রতিবাদে ডেপুটেশন

সংবাদে প্রকাশ, ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম রাজ্য যেখানে রাজ্য সরকার স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা চালু করতে যাচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকার জীবনশৈলী শিক্ষা নাম দিয়ে ২০০৪ সালে ঘোষণা করেছিল যে, এ রাজ্যে তারা স্কুলস্তরে জীবনশৈলী শিক্ষা চালু করবে। এই ঘোষণার সাথে সাথে বিভিন্ন মহল থেকে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে গত দু'টি শিক্ষাবর্ষে তারা এটা চালু করতে পারেনি। বর্তমানে সরকার সমস্ত প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করে রাজ্যের সমস্ত স্কুলে ষষ্ঠশ্রেণী থেকে জীবনশৈলী শিক্ষার নামে যৌনশিক্ষা চালু করছে।

খড়্গপুর শহরে সিলভার জুবিলি স্কুলে এই শিক্ষা ক্লাসে পড়ানোর কথা স্কুল কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করলে অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা দেয়। ২৪ জুন সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং ছাত্র সংগঠন সারা ভারত ডিএসও-র খড়্গপুর লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে এর বিরোধিতা করে প্রধান শিক্ষককে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। স্মারকলিপিতে বলা হয় যে, এইডস্ সচেতনতা বাড়াবার নাম করে ছাত্রছাত্রীদের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলতে সরকারের এ এক সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ। এই বয়সের ছেলেমেয়েদের যখন বিভিন্ন মনীষীদের জীবনী পড়ানো, খেলাধূলা, শরীরচর্চার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা দরকার ছিল; কেটে যাওয়া, পুড়ে যাওয়া, সাপে কামড়ানো, জলে ডোবা প্রভৃতি দুর্ঘটনাতে প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কিত শিক্ষা দেওয়া দরকার ছিল — তখন যৌনশিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে। কলেরা, টিবি, নিউমোনিয়া, ম্যালেরিয়া, এনকেফেলাইটিস প্রভৃতির মত রোগ যা এইড্সের চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপকতা এবং ভয়াবহতা নিয়ে আমাদের দেশে রয়েছে, সেখানে এই রোগগুলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা এবং প্রতিকার নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানবৃদ্ধি করার পরিবর্তে শুধু এইড্স সচেতন করার একপেশে ঝোঁকের তাঁরা তীব্র বিরোধিতা করেন। প্রধান শিক্ষক তাঁর অসহায়তার কথা বলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ডি আইকে এই বক্তব্যগুলি জানাবার অঙ্গীকার করেন। প্রতিনিধিরা খড়্গপুর সাউথ সাইড বয়েজ এবং গার্লস স্কুলেও ডেপুটেশন দেন। প্রতিনিধি দলে মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ছিলেন সুনীতা গুপ্ত এবং জয়শ্রী চক্রবর্তী, ডি এস ও-র পক্ষে ছিলেন বিবেকানন্দ সাহু, মণিশঙ্কর পট্টনায়ক এবং রাধাপদ দাস।

জীবনশৈলী শিক্ষার নামে কুশিক্ষা চালুর প্রতিবাদে পূর্ব মেদিনীপুরে নাগরিক কনভেনশন

গত ২৫ জুন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার ঘোষখানা (ডিমারী) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এলাকার বিশিষ্ট নাগরিকদের উদ্যোগে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশমশ্রেণী পর্যন্ত জীবনশৈলী শিক্ষা চালু, মদের ঢালাও লাইসেন্স, এইড্স প্রতিরোধের নামে অশ্লীল বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপনে নগ্ন নারীদেহ প্রদর্শনের প্রতিবাদে এই কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন সোমনাথ চক্রবর্তী। সরকারি নীতির সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন যুগল কৃষ্ণ গোস্বামী, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শশাঙ্ক শেখর পণ্ডা, বিশিষ্ট শিক্ষক বিষ্ণুপদ মাইতি, অরূপ সামন্ত এবং রেখা দাস। মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন ডি এস ও'র বিশিষ্ট সংগঠক স্নেহাশীষ বক্সী। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা অনিতা মাইতি।

বিশেষ অতিথির ভাষণে স্বাস্থ্য আন্দোলনের সুপরিচিত নেতা ডাঃ বিশ্বনাথ পড়িয়া বলেন, জীবনশৈলী শিক্ষা ছাত্রছাত্রীদের নৈতিক অবক্ষয় বৃদ্ধি করবে। নরনারীর যৌনসম্পর্কের বিষয় বা শৈশব থেকে কিশোর বয়সে শারীরিক বিভিন্ন অঙ্গের পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয় যা জীবনশৈলী শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তা ১২/১৩ বৎসরের কিশোরদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ক্ষতিকর। তিনি জীবনশৈলী শিক্ষার বিরুদ্ধে সর্বস্তরের অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগী মানুষকে আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

হাওড়া শরৎ সদনে অশ্লীল নাটক প্রদর্শনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

হাওড়া শহরে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত শরৎ সদনে অশ্লীল নাটক প্রদর্শনের বিরুদ্ধে ডি এস ও, ডি ওয়াই ও এবং এম এস এস-এর উদ্যোগে সদনের সামনে ২৮ জুন তুমুল বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভসভায় বক্তারা বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি রাজ্য সরকারও শিল্প, কলকারখানা, কৃষি, খুচরো ব্যবসা প্রভৃতি ক্ষেত্রে যেমন বিদেশি পুঁজিকে অবাধে ডেকে আনছে তেমনই সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সাম্রাজ্যবাদী অধঃপতিত সংস্কৃতিকে এদেশে অবাধে ঢুকতে সাহায্য করছে। তারই ফল হিসাবে মদের ঢালাও লাইসেন্স ও অনলাইন লটারির রমরমার পাশাপাশি সরকারি প্রতিষ্ঠানে অশ্লীল নাটক প্রদর্শনের ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে। ইতিপূর্বে ২০০৪ সালে বাংলার অন্যতম ঐতিহ্যমণ্ডিত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামাঙ্কিত রবীন্দ্রসদনে সরকারি অনুমোদনে অত্যন্ত অশ্লীল নাটক প্রদর্শনের বিরুদ্ধে ১০ জুন সদনের সামনে এ আই ডি ওয়াই ও বিক্ষোভ দেখায় এবং তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের সংস্কৃতি বিভাগের জয়েন্ট ডাইরেক্টর ও রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষকে স্মারকলিপি দিয়ে অবিলম্বে নাটক বন্ধ করার দাবি জানায়। শেষপর্যন্ত কর্তৃপক্ষ নাটক বন্ধ করতে বাধ্য হয়। এদিনের বিক্ষোভসভা থেকে হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানকে স্মারকলিপি দেওয়া হয় এবং দাবি জানায়, অবিলম্বে এই নাটকের প্রদর্শনী বন্ধ করতে হবে; ভবিষ্যতে যাতে এখানে এই ধরনের নাটক প্রদর্শিত না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে; এলাকায় সুস্থ সংস্কৃতির উপযোগী পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।

উল্লেখ্য, এলাকার বহু সাধারণ মানুষ ও নাটকটি দেখতে আসা দর্শকদের একাংশ বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেন।

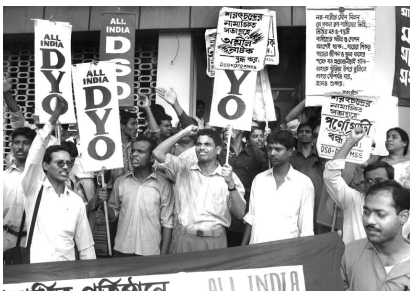

দেওয়াল লিখন নিষিদ্ধ থাকলে প্রাথমিকে ইংরেজি ফিরত কিনা সন্দেহ

দেওয়াল লিখন আইন করে বন্ধ করা হয়েছিল প্রায় তিন দশক আগে। জরুরি অবস্থার সময় সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার, সরকারবিরোধী আন্দোলন ঠেকাতে এবং সমস্ত বিরোধী কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করতে এই আইন জারি করেছিল। দৃশ্যদূষণ আটকাবার নামে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার রক্ষার আইনি প্রশ্ন তুলে তারা জারি করেছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রিভেনশন অফ ডিফেসমেন্ট অ্যাক্ট ১৯৭৬ (ওয়েস্টবেঙ্গল অ্যাক্ট ২১ অফ ১৯৭৬)। শুরু থেকেই এই আইনের অসৎ উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করে বিরোধিতা করেছিল এস ইউ সি আই। দলের তদানীন্তন রাজ্য সম্পাদক (বর্তমানে সাধারণ সম্পাদক) কমরেড নীহার মুখার্জী খুব স্পষ্ট ভাষায় সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের উদ্দেশে খোলা চিঠি দিয়ে বলেছিলেন যে, মানুষের আদর্শগত ও রাজনৈতিক প্রচারের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করতে এই আইন আনা হয়েছে। দৃশ্যদূষণকে অজুহাত করে আন্দোলনকে দমন করতে এবং বিরোধী কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করতে যে আইন করা হল, সেই আইন কি শুধু আইন বলেই মেনে নিতে হবে ? এর সঙ্গে অন্যায় আর মিথ্যাচারের যোগ খুবই স্পষ্ট। সেদিন অন্যান্য রাজনৈতিক মহল থেকেও এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠেছিল, যে জন্য কংগ্রেস সরকার সেই আইন কার্যকর করতে পারেনি। এভাবে একসময় যে আইন অন্যায় আর মিথ্যাচারের মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছিল, তাকে তো প্রথম সুযোগেই বিদায় করা কর্তব্য ছিল সিপিএম সরকারের। অথচ একটানা ৩০ বছর নিরবচ্ছিন্ন ক্ষমতায় থেকেও সিপিএম-ফ্রন্ট, সেই আইনকে প্রয়োগ না করলেও বাতিল করার কথা ভাবেনি। পরিবর্তে সে আইন কতখানি গণতান্ত্রিক রীতিনীতিসম্মত, তা নিয়ে এখন আলাপ-আলোচনার আসর বসিয়েছে। সে আইন বাতিল করা ঠিক হবে কি না-হবে, তা নিয়ে বিতর্ক শুরু করেছে।

দেওয়াল লেখার ইতিহাস খুবই প্রাচীন। আলতামিরার গুহার বুনো বাইসনের চিত্র, ভীমবেটকার গুহাচিত্র, অজন্তা-ইলোরার চিত্রমালা, অশোকের শিলালিপি কি কেবলই ছবি বা লেখা, যা দেওয়ালের সৌন্দর্যকে নষ্ট করে বা সৌন্দর্যপ্রিয় মানুষদের বিরক্ত করে? দেওয়ালের বহু লেখাচিত্র আমাদের কৃষ্টি-সভ্যতাকে জানতে সাহায্য করেছে, আমাদের জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করার মধ্য দিয়ে সভ্যতার অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছে। আমাদের চিন্তা, মনন, শিল্পভাবনাকে বিকশিত করার মধ্য দিয়ে আমাদের সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে। দেওয়ালের লেখা বহু অন্যায়ের প্রতিকারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আত্মসর্বস্ব জীবনকে নাড়া দিয়েছে, বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মুখোমুখি করেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ের যুগে দেওয়ালের ওপর লাগানো বহু পোস্টার এবং লিখন সংগ্রামের বার্তাকে দেশের প্রান্তে-প্রত্যন্তে ছড়িয়ে দিয়েছে, উদ্দীপিত করেছে ছাত্র-যুব সহ নানা অংশের অসংখ্য মানুষকে। দেশবন্ধু, গান্ধীজী, নেতাজী, মাস্টারদার বহু আহ্বান দেওয়ালের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে, জাগিয়ে তুলেছে ঘুমন্ত ভারতবাসীকে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, বিবেকানন্দের বহু বক্তব্য দেওয়ালের মধ্য দিয়ে প্রস্ফুটিত হওয়ার সুবাদে মানুষ চিন্তা-চেতনা, উন্নত চরিত্র গঠনের সন্ধান পেয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে দেওয়ালের বহু বার্তা অন্যায়ের বিরুদ্ধে বহু লড়াই সংগঠিত করতে সাহায্য করেছে। দেওয়াল লিখন, পোস্টার-ফেস্টুন লাগানো নিষিদ্ধ থাকলে, সিপিএম সরকারের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে গিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার সংহার রোখা সম্ভব হত কিনা, প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ভাষাশিক্ষা ব্যবস্থা চালু হত কি না, সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ থেকে যায়। কারণ এই দাবির সমর্থনে জনমত গঠনে দেওয়াল লিখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। একই কারণে সন্দেহ থেকে যায়, এ বছরের গোড়ার দিকে আমরণ অনশন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কৃষি-বিদ্যুতে মাশুল কমিয়ে কৃষকদের স্বার্থরক্ষা করা সম্ভব হত কি না।

আইন প্রণয়নের দীর্ঘ তিন দশক পর দেওয়াল লিখন, দেওয়ালে পোস্টার লাগানো, ফেস্টুন টাঙানো প্রথমবারের জন্য সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করল নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনকে ঘিরে এই আইনকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। পরিচ্ছন্নতা সবাই চাইবে। কিন্তু এই চাওয়া শুধু দেওয়ালকে ঘিরে ভোটকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল কেন? পরিচ্ছন্নতার প্রশ্নে সারা রাজ্যে রাস্তাঘাটের কী হাল? রাস্তাঘাট খানাখন্দ, জঞ্জাল যত্রতত্র স্তূপীকৃত। কলকাতা শহরসহ সর্বত্র কোন না কোন কারণে রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। নর্দমা-পয়ঃপ্রণালীর শোচনীয় অবস্থা মশা-মাছির বংশবৃদ্ধিতে সাহায্য করছে। বাড়ছে রোগ জীবাণু। বহু জায়গায় পরিশ্রুত পানীয় জলের অভাব। আর্সেনিকযুক্ত জলের ব্যবহার বহু মানুষকে অসুস্থ করে তুলছে। বিভিন্ন পণ্যের বাজার তৈরির জন্য অসংখ্য দেওয়াল লিখন, লম্বা চওড়া আলোকোজ্জ্বল দৃষ্টি আকর্ষণকারী হোর্ডিং, কুরুচিকর এমনই হাজার দৃশ্য কিন্তু 'সুন্দরের পূজারীদের' চিন্তিত করেনি, করেছে রাজনৈতিক দলের দেওয়াল লিখন, পোস্টারিং। এগুলিকে নিষিদ্ধ করে তারা রাজ্যের সৌন্দর্য বাড়াতে চাইছে। এ তো অনেকটা খোস-পাঁচড়া-বিষাক্ত ঘায়ে জর্জরিত কোন শরীরের উপর স্নো-পাউডার সহ অন্যান্য প্রসাধনী লাগিয়ে সুন্দর করার ব্যর্থ চেষ্টা।

দেওয়ালে সংগ্রামের কোন বার্তা, জ্ঞানের কোনও কথা থাকলে তা দেওয়ালকে কোনওভাবেই অপরিচ্ছন্ন করে না, বরং তা দেওয়ালের সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে। বহু স্কুলের দেওয়ালে মনীষীদের ছবিসহ কিছু উদ্ধৃতি ফুটিয়ে তোলা হয়। এগুলি ফাঁকা দেওয়ালের চেয়ে অনেক বেশি সৌন্দর্যমণ্ডিত। আসলে, সৌন্দর্য ধারণার মধ্যে সঙ্কীর্ণতা লুকিয়ে থাকলে, পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার প্রশ্নটি যুক্ত হয়ে থাকলে এই দেওয়াল লিখনকেও দূষণের দায়ে অভিযুক্ত করা যেতে পারে। অন্যের দেওয়ালে লিখলে অনুমতি নেওয়ার ব্যাপার থাকতেই পারে, কিন্তু নিজের দেওয়ালেও দৃশ্যদূষণ(?) ঠেকাতে "বিজ্ঞাপন মারিবেন না" ছাড়া অন্য কিছু লিখতে পারব না — এতো গণতান্ত্রিক অধিকারের উপরে হস্তক্ষেপ।

আসলে এরা চাইছে, আদর্শগত ও রাজনৈতিক প্রচারের গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করতে। কিন্তু সেকথাও পরিষ্কার করে তারা বলতে পারছে না। এখানেও শঠতা করছে, অজুহাতের আশ্রয় নিচ্ছে। তারা জানে, গরিব-সাধারণ মানুষের দাবি নিয়ে যারা লড়াই করে, আন্দোলন সংগঠিত করে তাদের আটকাতে গেলে এটা হল মোক্ষম দাওয়াই। এদের পয়সা কম, তাই এদের ক্ষমতা হবে না বেশি টাকা খরচ করে সাধারণ মানুষের কাছে খবরের কাগজ, টিভি, রেডিওতে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাদের বক্তব্য পৌঁছে দিতে। ফলে গণতান্ত্রিক আন্দোলন দুর্বল হবে। যেকোন শোষণমূলক ব্যবস্থায় শোষকশ্রেণী এটাই চায়। তাদের পৃষ্ঠপোষক রাজনৈতিক দলগুলি এর ফলে কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। তারা প্রচারও পাবে, অর্থও পাবে। আর তাদের স্বার্থবিরোধী কথাবার্তা বলে কার্যক্রম নেয় যে রাজনৈতিক দলগুলি, ক্ষতি হবে তাদের। শোষকশ্রেণীর সেই ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে আজ সিপিএম সরকারও দায়বদ্ধ। সরকার যেমন টাটা-সালিমদের অল্প দামে জমি পাওয়ার, মানুষকে ইচ্ছামত শোষণ করার অধিকার দেওয়ার ব্যাপারে দরাজ, তেমনি দেওয়াল লিখন বন্ধ করে সাধারণ মানুষের বক্তব্য যাতে প্রচারিত হতে না পারে, ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলন যাতে গড়ে উঠতে না পারে, সে বিষয়েও যথেষ্ট সজাগ।

মার্কিন মিথ্যাপ্রচারের মুখোশ খুলে দিল আফগান জনগণ

ওসামা বিন লাদেনকে গ্রেপ্তার করার নাম করে আফগানিস্তান দেশটিকে তছনছ করে দিয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। একটি পুতুল সরকারকে সেদেশের ক্ষমতায় বসিয়ে তারা প্রচার করছে যে, আফগানিস্তানে এখন শান্তির স্বর্গ বিরাজ করছে। হোয়াইট হাউসের এই দাবি যে চরম মিথ্যা তা আবার প্রমাণ করলেন আফগানিস্তানের সাধারণ মানুষ। ২৮ মে থেকে হাজার হাজার আফগান জনগণ কাবুলে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। নিজেদের জীবনের পরোয়া না করে তাঁরা আমেরিকান ও অন্যান্য বিদেশিদের লক্ষ্য করে ইঁট-পাথর, যা পাচ্ছেন ছুঁড়ে মারছেন। ২৯ মে মার্কিন ফৌজি গাড়িগুলির মধ্যে ভয়াবহ এক সংঘর্ষ ঘটে। এই ঘটনাকে অজুহাত করে মার্কিনবাহিনী গুলি চালালে বেশ কিছু মানুষ গুলিবিদ্ধ হন, এমনকী অনেকে প্রাণও হারিয়েছেন। এই ঘটনার পর আফগানিস্তানের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। ফলে ওয়াশিংটনের মার্কিন সরকারি কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আফগানিস্তানের পুতুল সরকার যে ঐদেশে কোনরকম রাজনৈতিক স্থিরতা আনতে পারেনি, এই দুর্ঘটনা ও তার পরবর্তী বিক্ষোভ তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেল। একথাও পরিষ্কার যে, মার্কিন ট্রাকগুলির উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে, কিংবা মার্কিন সেনার পরিবর্তে নতুন ন্যাটো বাহিনীকে আফগানিস্তানে এনে পরিস্থিতি সামলানো বা উন্নত করা যাবে না। এমনকী অবিশ্বাস্য হলেও যদি প্রমাণিত হয় যে, মার্কিন সেনারা প্রথমে গুলি চালায়নি, তাহলেও শান্তি ফিরবে না। আফগান যুবকদের জন্য সামান্য কিছু চাকরির সংস্থান করে তাদের মন জয় করা যাবে না। সেদেশের ২ কোটি ৪০ লক্ষ ক্ষুধার্ত জনগণের বেশিরভাগই আমেরিকার এই দখলদারিকে ঘৃণা করে। কিছু রুটির টুকরো ছড়িয়ে এদের আনুগত্য পাওয়া যাবে না।

এই বিক্ষোভের সূত্রপাত ২৮ মে'র অনেক আগে। বহু দশক ধরে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা আফগানিস্তানে দখলদারি করছে আফগান জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করে। আফগানিস্তানে ১৯৭৮ সালে একটি প্রগতিশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সরকার নারীশিক্ষা প্রবর্তনের সাহস দেখিয়েছিল ও কৃষকদের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। সেই প্রগতিশীল সরকারকে উৎখাত করার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সেই সময় বহু বিলিয়ন ডলার নগদ টাকা এবং অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছিল আফগান প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় নেতা ও যুদ্ধবাজদের। পাক সরকারও এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়েছিল। এই আক্রমণের বিরুদ্ধে সামন্ততন্ত্রবিরোধী তৎকালীন আফগান সরকার সোভিয়েট সাহায্য প্রার্থনা করেছিল। কিন্তু সেই সাহায্য ওয়াশিংটনের 'প্রক্সি-সেনাবাহিনী'র সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারেনি।

সোভিয়েট সেনাবাহিনী চলে যাবার পর প্রগতিশীলতার যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তা ১৯৯০-এর দশকে রক্তপাতের মাধ্যমে মুছে ফেলা হয়। এরপর আফগানিস্তানের শাসনব্যবস্থা দখল করে প্রতিযোগী সামন্তী নেতারা, অর্থাৎ জমিদাররা। তাদের হটিয়ে দেয় পাকিস্তানের মদতপুষ্ট তালিবান শাসন। শুরুতে ওয়াশিংটন এই তালিবান শাসনকে সাদরে গ্রহণ করেছিল এবং পাকিস্তান এক্ষেত্রে মার্কিন এজেন্ট হিসাবে কাজ করছিল। পরে তালিবানরা মার্কিন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে থাকে। এরপর আমেরিকার 'টুইন টাওয়ার' ধ্বংস ওসামা বিন লাদেনের আল কায়দা বাহিনীর কাজ বলে সন্দেহ করা হয় এবং আফগানিস্তানে ওসামা লুকিয়ে আছে, এই অজুহাতে সেদেশে মার্কিন হানাদারি চলে; সেখানকার তালিবান সরকারকে হটিয়ে বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

২৮ মে'র বিক্ষোভ যে সত্য উদ্‌ঘাটন করে, তা হ'ল, মার্কিন মদতপুষ্ট আফিং ব্যবসায়ী কিছু সামন্তী প্রভু আফগানিস্তানের দূরবর্তী প্রদেশগুলি শাসন করছে এবং তালিবান সন্ত্রাসবাদ ক্রমশ বিদেশি দখলদারির বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধ আন্দোলনে পরিবর্তিত হচ্ছে। এই বিক্ষোভ আরও প্রমাণ করল যে, আফগানিস্তানের অধিকাংশ মানুষই মার্কিন ও ন্যাটো সেনাবাহিনীকে, তাদের মাতৃভূমির বেআইনি দখলদার একটি নিষ্ঠুর ও নৃশংস বাহিনী হিসাবে দেখে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, আফগানিস্তানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পরিচালিত পুতুল সরকারের যিনি রাষ্ট্রপতি, সেই হামিদ কারজাই ছিলেন মার্কিন এনার্জি কোম্পানি 'ইউনোক্যাল'-এর এক বড়কর্তা।

মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ পেন্টাগন ভেবেছিল, আতঙ্ক ছড়িয়ে তারা গোটা বিশ্ব শাসন করতে পারবে। ২৮ মে'র বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে প্রমাণ হয়ে গেল, সারা দুনিয়া দূরের কথা, শুধুমাত্র কাবুলকেই শাসনের আওতায় আনা তাদের ক্ষমতার বাইরে। তাই ২৮ মে ২০০৬ -এর বিক্ষোভের ঘটনাটিকে 'টার্নিং পয়েন্ট' হিসাবে গণ্য করাই সমীচীন হবে।

ক্রোয়েশিয়া

তামাক কারখানা দখল করল শ্রমিকরা

ক্রোয়েশিয়ার 'জাগ্‌রেব' তামাক কারখানা, ১৯৯০-এ যেটি বেসরকারি মালিকের হাতে চলে গিয়েছিল, গত এপ্রিল মাসে পঞ্চাশ জন শ্রমিক সেটি দখল করে নেন। তাঁদের বক্তব্য, বেআইনিভাবে তামাক কারখানাটিকে বেসরকারীকরণ করা হয়েছিল।

এর আগে 'জাগ্‌রেব'-এর শ্রমিকদের ঘাড়ে যখন মজুরি-ছাঁটাইয়ের কোপ পড়েছিল, অধিকাংশ শ্রমিকই বিনা প্রতিবাদে তা মেনে নিয়ে কারখানার কাজ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু যে পঞ্চাশ জন শ্রমিকের কথা আগে বলা হল, তাঁরা ঐ পরিস্থিতিতেও হাল ছাড়েননি। তাঁরা জানিয়েছেন, তাঁদের এ লড়াই শুধু নিজেদের প্রাণরক্ষার সংগ্রাম নয়; গোটা দেশজুড়ে মানুষের উপর যে অন্যায় অত্যাচার চলছে এ লড়াই সংগঠিত হচ্ছে তার বিরুদ্ধে।

পূর্বতন যুগোশ্লাভিয়া রাষ্ট্রটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার পর যেদিন থেকে ক্রোয়েশিয়াকে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়, সেদিন থেকেই শুরু হয়েছে শ'য়ে শ'য়ে কারখানার বেসরকারীকরণ। দেশ ছেয়ে গেছে দুর্নীতিতে। ক্রোয়েশিয়ার হাজার হাজার মানুষ আজ বেকার। বেকারত্বের হার ১৮ শতাংশ।

মার্কিন সেনাঘাঁটির বিরুদ্ধে দক্ষিণ কোরিয়ায় তুমুল গণবিক্ষোভ

দক্ষিণ কোরিয়ায় ত্রিশ হাজার মার্কিন সেনা মোতায়েন রয়েছে। এশিয়ার মধ্যে এটিই হল সর্ববৃহৎ মার্কিন সেনাঘাঁটি। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তাদের সেনাঘাঁটিকে আরও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে রাজধানী সিওলের চল্লিশ মাইল দক্ষিণে ইয়ংটায়েকে সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এর বিরুদ্ধে গত ১৩ মে দক্ষিণ কোরিয়ার ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক সহ সর্বস্তরের প্রায় দশ হাজার মানুষ সিওলের পথে পথে বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হন।

বিক্ষোভ মিছিলের সংগঠকদের বক্তব্য, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সমাজতান্ত্রিক উত্তর কোরিয়া আক্রমণের মতলব থেকেই দক্ষিণ কোরিয়ায় এভাবে সেনা মোতায়েন করছে। কিম কিউ চাল নামে এক সংগঠক মন্তব্য করেছেন, "যতদিন পর্যন্ত মার্কিনবাহিনী এ'দেশে ঘাঁটি গেড়ে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত আমরা যুদ্ধের আতঙ্কের হাত থেকে রেহাই পাব না।" তাই ১৩ মে'র বিক্ষোভ মিছিলে স্লোগান উঠেছে — 'মার্কিন সেনা প্রত্যাহার কর', 'প্রতিরক্ষামন্ত্রী নিপাত যাক' ইত্যাদি।

এই বিক্ষোভ মিছিলের এক সপ্তাহ আগে ৬ মে ইয়ংটায়েকের বাসিন্দা হাজার হাজার কৃষিজীবী প্রস্তাবিত সেনাঘাঁটির সামনে বিক্ষোভ দেখালে দক্ষিণ কোরিয়ার 'রায়ট পুলিশ'-এর সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ বেঁধে যায়। সেনাঘাঁটি গড়ে তোলার জন্য গোটা ইয়ংটায়েক গ্রামের জনবসতিকে ছেঁটে ফেলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

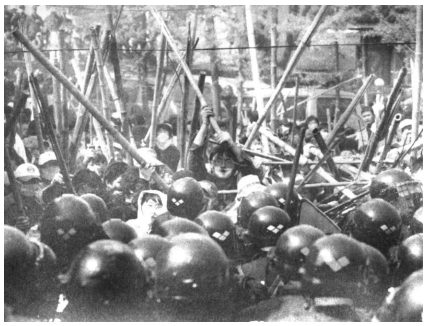

বাহরিন

জুলুমের প্রতিবাদে শ্রমিক ধর্মঘট

পারস্য উপসাগরীয় দেশ বাহরিনে এ'বছরের এপ্রিল মাসে বাহরিন পেট্রোলিয়াম কোম্পানির দু'হাজার ঠিকাশ্রমিক কাজের সুপরিবেশের দাবিতে ধর্মঘটে সামিল হয়েছিলেন। এই শ্রমিকদের অধিকাংশই ভারত এবং পাকিস্তান থেকে সেদেশে কাজ করতে গিয়েছেন।

পারস্য উপসাগরের অন্যান্য দেশগুলির মতো বাহরিনের চুক্তি-শ্রমিকরাও অত্যন্ত জঘন্য পরিবেশে দিন কাটাতে বাধ্য হন। কোম্পানির নির্দিষ্ট করে দেওয়া উঁচু দেওয়াল ঘেরা এলাকায় প্রায় ক্রীতদাসের মতো জীবনযাপন করেন বিদেশি ঠিকাশ্রমিকরা।

এই অবস্থায় বাহরিন পেট্রোলিয়াম কোম্পানির এক কর্মীকে প্রতিবেশি দেশ কাতারের একটি কারখানায় বদলি করে দেওয়ার নোটিশ জারি করে কর্তৃপক্ষ। কাতারের যে 'ডি-সালফারাইজেশন' প্ল্যান্টে ঐ কর্মীকে চলে যেতে বলা হয়েছিল, সেই কাজটি ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক। ফলে কর্মীটি সেখানে যেতে অস্বীকার করেন। কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়। এই ঘটনা ঠিকাশ্রমিকদের বুকে জমে থাকা ক্ষোভের বারুদে অগ্নিসঞ্চার করে। কারখানার প্রায় দু'হাজার শ্রমিক, সহকর্মীর উপর কর্তৃপক্ষের এই অন্যায় জুলুমের প্রতিবাদে কাজ বন্ধ করে দেন। শ্রমিকরা দাবি করেন, বিপজ্জনক কাজের ক্ষেত্রে মজুরির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে এবং তাঁদের কাজ ও বাসস্থানের ক্ষেত্রে ভালো পরিবেশের বন্দোবস্ত করতে হবে। বাহরিন কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের মধ্যে সমঝোতার পর ২১ এপ্রিল শ্রমিকরা ধর্মঘট তুলে নেন।

বলিভিয়া

গ্যাস ও তেলসম্পদ জাতীয়করণ করলেন প্রেসিডেন্ট মোরালেস

গত ১ মে বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট ইভো মোরালেস দেশের গ্যাস ও তেলসম্পদ জাতীয়করণ করার কথা ঘোষণা করেছেন এবং সেনাবাহিনী পাঠিয়ে তৈলক্ষেত্রগুলির দখল নিয়েছেন।

ব্রাজিল, স্পেন, আর্জেন্টিনা, ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের বহু তেল কোম্পানি বলিভিয়ায় তেল ব্যবসায় নিযুক্ত। জাতীয়করণের ফলে নতুন যে ডিক্রি সেদেশে জারি করা হয়েছে তাতে এই সমস্ত কোম্পানিগুলির সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা না হলেও তাদের উপর নতুন কিছু শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত লভ্যাংশের সিংহভাগই ভোগ করত তেল কোম্পানিগুলি, আর নামমাত্র জমা পড়ত সরকারি কোষাগারে। নতুন ডিক্রিতে লভ্যাংশের এই অনুপাত বদলে ফেলার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এই শর্ত না মানলে তারা ব্যবসা করার অধিকার হারাবে।

প্রসঙ্গত বলা যায়, দেশের তেলসম্পদ বেসরকারীকরণের প্রতিবাদে ২০০৪ সালে বলিভিয়ায় যে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তারই পরিণতিতে এ'বছরের গোড়ায় সাধারণ নির্বাচনে মোরালেস জয়ী হন।

তেলসম্পদ জাতীয়করণের কথা ঘোষণা করতে গিয়ে ইভো মোরালেস বলেন, "সেই বহুপ্রতীক্ষিত ঐতিহাসিক ক্ষণটি আজ উপস্থিত হয়েছে; আজ বলিভিয়া আবার তার প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার লাভ করল।"

দিল্লি-মুম্বইয়েও বস্তিবাসীদের উপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস

'উন্নয়ন' আজ সর্বব্যাপী! সরকারি, বেসরকারি সমস্ত মিডিয়ায় আজ এই উন্নয়নই সবচেয়ে বড় ইস্যু। এই উন্নয়নকে সামনে রেখে সরকার থেকে বহুজাতিক পুঁজি, সকলেই আজ এক স্বপ্নের ফেরিওয়ালা। চারিদিকে ভাষণের প্লাবন — উন্নয়নের মহাসড়ক ধরে এগিয়ে চলেছে দেশ। এই পথেই হবে দেশের উন্নতি। হয়তো বা হাতের মুঠোয় পুরে ফেলা যাবে আকাশটাও। তবে তার জন্য আগে নিষ্কণ্টক করে তোলা দরকার এই পথটাকেই, যাতে কোনওভাবেই এই উন্নয়নের পরিকল্পনা বাধাপ্রাপ্ত না হয়। তার জন্য যদি কিছু মানুষকে কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়, করতে হবে। দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের অবাধ যাতায়াতের পথকে মসৃণ রাখতে, তাদের শিল্পের জন্য জমির জোগান দিতে, শহরের সৌন্দর্যায়নের স্বার্থে যদি কিছু মানুষকে এমনকী আজন্মের ভিটেমাটি ছেড়েও পথে দাঁড়াতে হয়, কী আর করা যাবে? বৃহত্তর স্বার্থে এরকম কিছু ত্যাগ স্বীকার তো করতেই হয়! তাতে শেষপর্যন্ত নাকি দেশেরই লাভ!

মোটামুটি এইরকমের বক্তব্যই হল উন্নয়নপন্থীদের। তবে তাদের এই উন্নয়নের বাগাড়ম্বরের তলায় যে অবধারিত প্রশ্নটা চাপা থেকে যায়, তা হল — এই দেশটা কাদের? এ কীসের উন্নয়ন? কাদের উন্নয়ন? খালপাড়ের বস্তি থেকে, গোবিন্দপুর রেল কলোনি থেকে যে মানুষগুলোকে উচ্ছেদ হতে হল, বা উন্নয়নের ধাক্কায় বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানাগুলো থেকে যে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক-কর্মচারীকে কাজ হারিয়ে পথের ভিখারিতে পরিণত হতে হল, তাদের কাছে এসবের মানে কী? দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজির পৃষ্ঠপোষকতায় এই যে উন্নয়নের জোয়ার, তার এক অতি আবশ্যিক অঙ্গই তো এই উচ্ছেদ, বেকারি, অনাহার। তাই এই সমস্ত ভিটেমাটিহারা, সহায়-সম্বলহীন, দিগ্‌ভ্রান্ত, কর্মহারা মানুষের দল এই ঝকমকে ফ্লাইওভার, শপিং মল শোভিত উন্নয়নেরই এক অবধারিত বিপরীত মুখ।

আজকের বহুল প্রচারিত উন্নয়নের এই হল বাস্তব রূপ। রাজ্যে রাজ্যে তার প্রয়োগ ক্ষেত্রে বহিরঙ্গে প্রলেপের কিছু প্রভেদ থাকতে পারে, কিন্তু বাস্তবে তাদের মধ্যে ফারাক সামান্যই। এ ব্যাপারে কেন্দ্রে বা রাজ্যে কংগ্রেস বা সিপিএম বা অন্যকোনও দল যেই ক্ষমতায় থাকুক, কার্যক্ষেত্রে ফারাক ঘটে সামান্যই। যেটুকু যা আপাত ফারাক তা সীমাবদ্ধ থাকে শুধু বুকনিতেই। তাই আমরা দেখি পশ্চিমবঙ্গে যখন টালা ও টালিগঞ্জের খালপাড় থেকে গোবিন্দপুর রেল কলোনি পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষকে শেষ সম্বলটুকু হারিয়ে উৎখাত হতে হয়, একই ঘটনা ঘটে দিল্লি বা মুম্বইতেও। পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম ফ্রন্ট সরকার যেমন এর পিছনে যুক্তি তোলেন, কলকাতাকে বিশ্বমানের শহরে পরিণত করতে হবে— একই যুক্তি তোলা হয় মুম্বই ও দিল্লিতেও, যদিও সেখানে সরকারে রয়েছে কংগ্রেস। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কংগ্রেস-সিপিএমে বিরোধ বলে কিছু নেই। আর অদ্ভুতভাবে উভয় জায়গাতেই এইসব উচ্ছেদ অভিযানের পিছনে জুটে যায় হাইকোর্টের সমর্থনও। অথচ এই অভিযান যে সংবিধানের ২১ নং ধারায় স্বীকৃত নাগরিকদের জীবনের অধিকারের সরাসরি বিরোধী, তাকে আদৌ ধর্তব্যের মধ্যেই আনা হয় না।

২০০৬ সালের মার্চ মাস থেকে মুম্বই শহরে নতুন করে শুরু হয়েছে ব্যাপক উচ্ছেদ অভিযান। শহরের মান্ডালা অঞ্চলে এই অভিযানে অন্তত ৫০০০ পরিবারকে নিষ্ঠুরভাবে উৎখাত করা হয়। এইসব অভিযানে সাধারণত শহরের রাস্তাঘাট দখলমুক্ত করাকেই অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু মান্ডালার এই উচ্ছেদ অভিযানে আরেক অদ্ভুত অজুহাতকে ব্যবহার করা হয়েছে। মুম্বই শহরের উন্নতির নামে ইতিপূর্বে ২০০৪-০৫ সালে যেসব মানুষকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল, আদালত থেকে তাদের পুনর্বাসনের নির্দেশ দেওয়া হয়। এই পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় জমি উদ্ধারের নামেই আবার মান্ডালায় এই উচ্ছেদ অভিযান।

কোনরকম নোটিস ছাড়াই এই উচ্ছেদ অভিযান শুরু হলে খুব স্বাভাবিকভাবেই রুখে দাঁড়ান এলাকার মানুষ। সবার আগে ছিলেন মহিলা ও শিশুরা। কিন্তু পুলিস প্রতিরোধ আন্দোলন ভাঙতে ব্যাপক লাঠিচার্জ শুরু করে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে বস্তিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। মানুষ তখন তাদের শেষ সম্বলটুকু বাঁচানোর উদ্দেশ্যে তাড়াহুড়ো করে ঘরে ঢুকতে গেলে আবার প্রচণ্ড লাঠিচার্জ করা হয় তাদের ওপর এবং সেইসঙ্গে ব্যাপক ধরপাকড় করা হয়। বহু মহিলা ও প্রায় ৫০ জন পুরুষকে সেখানে গ্রেফতার করা হয়। তাদের মধ্য থেকে প্রতিরোধ আন্দোলনের সংগঠকদের বেছে বেছে তাঁদের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগ দায়ের করা হয়। এর বিরুদ্ধে অবশ্য এখনও পর্যন্ত আন্দোলন জারি আছে।

অপরদিকে দিল্লিতে ঐ একই অজুহাতে উচ্ছেদ অভিযানের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠলে সরকার সাময়িকভাবে পিছু হটতে বাধ্য হয়। এক্ষেত্রেও দিল্লির উন্নয়নের নামে এই উচ্ছেদ চালানো হচ্ছিল। দিল্লি হাইকোর্টও এই অভিযানের সাথে সহমত পোষণ করে বলে যে, 'মাস্টার প্ল্যান ২০২১ অনুযায়ী শহরকে পরিচ্ছন্ন করতে এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো দরকার।' কিন্তু এ সত্ত্বেও বস্তিবাসী, ছোট দোকানদার এবং হকারদের ব্যাপকভাবে উচ্ছেদ করা শুরু হলে প্রবল প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়। হাজার হাজার মানুষ দক্ষিণ দিল্লিতে এক সপ্তাহব্যাপী হাইওয়ে অবরোধ করে অনশন অবস্থান শুরু করে। এই আন্দোলনের প্রবল চাপে কংগ্রেস শাসিত সরকার শেষপর্যন্ত মাথা নোয়াতে বাধ্য হয় ও সংসদে 'দিল্লি বিশেষ অধিকার আইন, ২০০৬' নামক একটি বিল পাশ করানো হয়। এই বিল অনুযায়ী যদিও এক বছরের জন্য সমস্ত উচ্ছেদ অভিযান স্থগিত রাখা হয় ও এই সংক্রান্ত আদালতের নানা নির্দেশকেও এক বছরের জন্য মুলতুবি রাখা হয়, বাস্তবে মৌলিক নীতির কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। বরং উপরে উপরে এই স্থগিত রাখা বিলের আড়ালে এর মাধ্যমে কয়েকটি সাংঘাতিক আইনও পাশ করিয়ে নেওয়া হয়। যেমন এই বিলে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, উচ্ছেদ অভিযানের জন্য কোনওরকম পুনর্বাসনের দাবি আর করা যাবে না। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় সরকার এই বিলের জোরে এখন থেকে যেকোনও সময় যেকোন এলাকাকে 'স্পেশাল পাবলিক প্রজেক্ট'-এর

সাতের পাতায় দেখুন

মূল্যবৃদ্ধির কোপে সাধারণ মানুষ বিপর্যস্ত

একের পাতার পর

উঠলেন এবং পাল্টা বিবৃতি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু মূল্যবৃদ্ধির পুরো দায় চাপিয়ে দিলেন কেন্দ্রের উপর। বললেন, ''খাদ্যপণ্য সহ অন্যান্য পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রকের। ...শুধু খাদ্যমন্ত্রক নয়, নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীর দাম নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ক্যাবিনেট কমিটি আছে। তারা কী করছে!'' (গণশক্তি, ৩০-৬-০৬)

কেন্দ্রীয় সরকার যেমন 'মূল্যবৃদ্ধির পরিস্থিতি দৈনন্দিন ভিত্তিতে নজরদারি করার জন্য' ক্যাবিনেট সচিবকে 'বিশেষ দায়িত্ব' দিয়েছে, সিপিএম সরকারের পক্ষ থেকেও তেমনি 'খাদ্যশস্যের দামবৃদ্ধির কারণ খতিয়ে দেখতে রাজ্যের খাদ্যদপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' ব্যস, রাজ্য খাদ্যদপ্তরও চুপ করে বসে আছে বলা যাবে না, তারা এবার মূল্যবৃদ্ধির কারণ খতিয়ে দেখবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'দাম নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য আমরা কিছু ব্যবস্থা নেবার কথা বলব কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রককে' (গণশক্তি ৩০-৬-০৬)। এতেই রাজ্যের দায়িত্ব শেষ! এবার আমরা, রাজ্যের জনগণ, বুদ্ধদেববাবুদের কেন্দ্রের সঙ্গে 'কথা বলার' অপেক্ষায় দিন গুণতে থাকব। কী চমৎকার বন্দোবস্ত! কেন্দ্র ও রাজ্যের এমন কড়া দাওয়াইয়ের পর মূল্যবৃদ্ধি কি দেশছাড়া না হয়ে পারে?

মূল্যবৃদ্ধির কারণ যদি খাদ্য উৎপাদনে সঙ্কট হয়, তবে সেই সঙ্কট মেটাতে প্রয়োজনীয় খাদ্য আগে থেকে সংগ্রহ করে মজুদ করে রাখা হল না কেন? যদি কালোবাজারি, মজুতদাররা বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করায় মূল্যবৃদ্ধি ঘটে, তাহলে সেটা তো সরকারের অজানা থাকার নয়। অসাধু ব্যবসাদারদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণেও তো অসুবিধা ছিল না, কারণ সরকারের হাতে জনগণের টাকায় পোষা গোয়েন্দা দপ্তর আছে, 'অত্যাবশ্যক পণ্য আইন' আছে, পুলিশ আছে, মিলিটারি আছে। কিন্তু সেসব পথে তারা যায়নি। জনগণের দৈনন্দিন যন্ত্রণা দূরীকরণের কোন পদক্ষেপ তারা নেয়নি। বরং তারা পারস্পরিক দোষারোপের তরজায় মেতেছে। এমনই তরজা লড়াই ক'দিন আগেই আমরা দেখেছিলাম তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রশ্নে। কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় সরকার বিপুল ট্যাক্স ও সেস চাপিয়ে তেলের দাম দ্বিগুণ করে দিয়েছে; মানুষ ক্ষুব্ধ হওয়ায় কেন্দ্র বলল — রাজ্য তাদের চাপানো ট্যাক্স কমাক, পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম বলল — কেন্দ্র আগে তাদের চাপানো ট্যাক্স কমাক। বাস্তবে কেউ কমালো না। প্রতি লিটার পেট্রল-ডিজেলের দামের মধ্যে ৫০ শতাংশেরও বেশি কেন্দ্র ও রাজ্যের যে ট্যাক্স — সেটা জনগণের ঘাড়ে চাপানো হয়েছে। তেলের দামবৃদ্ধির পরিণামে পরিবহন খরচ বেড়ে তা অত্যাবশ্যক পণ্যগুলির দাম আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। দাম বাড়ার পর কেন্দ্র ও রাজ্য এখন তদন্তে নামছে — কেন জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে তা জানার জন্য। একে ধাপ্পা ছাড়া আর কী বলা সম্ভব?

দাম যে বাড়ছে তার প্রকৃত কারণ কী? গত ১৫ বছর ধরে উদার আর্থিক নীতি অনুসরণের মধ্য দিয়ে কংগ্রেস ও বিজেপি সরকার দেশে পণ্য উৎপাদন ও বন্টনের উপর থেকে দ্রুত সরকারি নিয়ন্ত্রণ তুলে নিয়ে সবকিছু বেসরকারি মালিকদের হাতে, মুনাফাবাজ ব্যবসাদারদের নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দিয়েছে। ঋণ দেবার শর্ত হিসেবে বিশ্বব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় সরকারকে সুপরিকল্পিত প্রস্তাব দিয়ে রেখেছে যে, গণবন্টন ব্যবস্থা অর্থাৎ রেশনিং ব্যবস্থা তুলে দিতে হবে। অন্যদিকে, ভারতের কৃষিপুঁজিপতি ও বড় বড় কৃষিপণ্য ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত মুনাফার স্বার্থে খাদ্যশস্য রপ্তানি অবাধ করা হয়েছে। দেশের আভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্যের বাজারেও সরকারি ভূমিকা শূন্যে ঠেকেছে। ফলে, খাদ্যশস্য নিয়ে মুনাফাবাজি ও কালোবাজারি চলছে অনায়াসে। এর সঙ্গে তেলের দামবৃদ্ধির প্রভাব যুক্ত হয়ে মূল্যবৃদ্ধিকে আরও মারাত্মক করে তুলেছে। কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা এগুলো কি জানেন না? রাজ্যের সিপিএম সরকার, তার নেতৃবৃন্দ ও মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাছে এই কারণগুলি কি অজানা? এসব তাঁরা বিলক্ষণ জানেন। এরপরও তাঁরা যখন মূল্যবৃদ্ধির কারণ জানতে রাজ্যের খাদ্যদপ্তরকে নির্দেশ দিচ্ছেন বলে ঘোষণা করেন, তখন বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হয় কি যে, এঁরা প্রকৃতপক্ষে আসল কারণটিকে ধামাচাপা দিয়ে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন?

সিপিএম নেতৃত্ব ও তাঁদের সরকার কেন্দ্রবিরোধী যত বাগাড়ম্বরই করুক না কেন, আসলে বিশ্বব্যাঙ্ক-আইএম এফের সঙ্গে একমত হয়ে তাঁরা সবাই একই উদার অর্থনীতির পথের পথিক, ব্যবসায়ীকরণ-বেসরকারীকরণের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদের বিশ্বস্ত সেবক হওয়ার প্রতিযোগিতায় এঁরা সবাই সামিল। তাই খাদ্যাভাব ও মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ৫০-৬০-এর দশকের ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলনের ঐতিহ্যমণ্ডিত সংগ্রামী পশ্চিমবাংলাকে, পশ্চিমবাংলার যৌবনকে তাঁরা ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে পুঁজিপতিশ্রেণীর বাহবা কুড়োচ্ছেন, বিশ্বব্যাঙ্কের প্রশংসা পাচ্ছেন। রাজ্যে সংগ্রামের উদ্যোগ দেখলেই, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ মাথা তুললেই পুলিশ, র‍্যাফ নামিয়ে তাঁরা নৃশংসভাবে তাকে ধ্বংস করছেন। নিজেদের দলের সঙ্গে থাকা বামপন্থী মানসিকতার যুবসমাজ তথা বামপন্থী জনগণকেও তাঁরা সংগ্রাম ভুলিয়ে দিয়েছেন এবং নানা মিথ্যা প্রতারণার কৌশলে তাদেরকেও পুঁজিপতিদের সেবায় ব্যবহার করছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতি ও পদক্ষেপের বিরুদ্ধে, উদার আর্থিক নীতির শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তোলার পথে আজ প্রধান বাধা কমিউনিস্ট নামধারী এইসব সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিগুলি। তাই পুঁজিবাদী শোষণ-লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে, উদার আর্থিক নীতির নির্মম আক্রমণের প্রতিরোধে আমেরিকা সহ সমগ্র দুনিয়ার সংগ্রামী মানুষ যখন বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে, তখন একদা গণআন্দোলনের পীঠস্থান পশ্চিমবঙ্গ প্রায় নীরব। একমাত্র এস ইউ সি আই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তার আলোকে প্রতিবাদী গণআন্দোলনের ঝাণ্ডা বহন করছে, বামপন্থী পশ্চিমবাংলার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে তারা লিপ্ত। শুধু পশ্চিমবাংলা নয়, গোটা ভারতবর্ষেই এস ইউ সি আই জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে প্রতিদিন লড়াই করে চলেছে। মনে রাখতে হবে, এই প্রতিবাদ-প্রতিরোধ না থাকলে মালিকশ্রেণী ও সরকারের শোষণ-বঞ্চনা ও আক্রমণও লাগাম ছাড়া হয়ে যায়, সমাজ থেকে বিবেকমনুষ্যত্ব হারিয়ে যায়। তাই কি আমরা হতে দেব?

এস ইউ সি আই-এর বিরুদ্ধে মামলা খারিজ হয়ে গেল

একের পাতার পর

ছাড়াও, এই প্রথম, আদালতের নির্দেশকে অজুহাত করে রাজ্য সরকার ঘোষণা করে যে, ১৭ নভেম্বর বন্‌ধের দিনে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের অফিসে যোগ দিতেই হবে ; যাঁরা আসবেন না, তাঁদের বেতন কেটে নেওয়া হবে। লক্ষণীয় ওই বন্‌ধের আগে বা পরবর্তীকালে অন্য কোনও দলের ডাকা অন্য কোনও বন্‌ধের ক্ষেত্রেই আদালত বা সরকারের পক্ষ থেকে এ'রকম নির্দেশ জারি করা হয়নি। এ সত্ত্বেও ১৭ নভেম্বরের বন্‌ধে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে তা সর্বাত্মকভাবে সফল করেছিলেন।

বন্‌ধের পর ওই মামলা শুরু হয় এবং প্রথম শুনানির দিন ১৭ ডিসেম্বর '০৪ রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ স্বয়ং নিজের বক্তব্য পেশ করতেহাইকোর্টে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর বক্তব্য মাননীয় বিচারপতিদের বিবেচনার জন্য লিখিতভাবে পেশ করেন, যা পরবর্তীকালে পুস্তিকাকারে ব্যাপক জনগণের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রায় দু'বছর ধরে এই মামলা চলার পর গত ১৬ জুনের শুনানিতে আইনজীবী পার্থসারথি সেনগুপ্তের সওয়াল প্রমাণ করে দেয় যে, নাসিরুদ্দিন নামে যে ব্যক্তির পক্ষ থেকে ওই আবেদন করা হয়েছিল, বাস্তবে সেই নামের কোনও ব্যক্তির অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায়নি। তারপরই মাননীয় দুই বিচারপতি ওই ভুয়া আবেদন খারিজ করে দেন।

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে অ্যাবেকার নেতৃত্বে মহাকরণ অভিযান ও আইন অমান্য

রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার নিজেকে কৃষকবন্ধু হিসাবে দাবি করে। কিন্তু এ রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী কৃষকেরা এ দাবি মানতে নারাজ। তাদের বক্তব্য সরকার যদি কৃষকবন্ধুই হবে, তাহলে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আদায় করা ২০ কোটি টাকা ভর্তুকি তুলে দিল কেন? কেনই বা ২০০৪-০৫ সালের তুলনায় এ বছর ৯৮ শতাংশ মাশুল বৃদ্ধি করল? গত ২৯ জুন সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির (অ্যাবেকা) ডাকা মিছিলে আসা কৃষকদের মধ্য থেকেই উঠে আসছিল এই কথাগুলি। এদিন ছিল তাদের মহাকরণ অভিযান। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলা থেকে পাঁচ হাজারেরও বেশি কৃষক এই মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন।

মিছিল শুরুর আগে কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে এক সংক্ষিপ্ত সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন অ্যাবেকার সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাস। সভার শুরুতেই অ্যাবেকার অন্যতম উপদেষ্টা, নাট্য আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা আলোকশিল্পী এবং বিশিষ্ট বামপন্থী ব্যক্তিত্ব তাপস সেনের আকস্মিক মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে একটি প্রস্তাব পাঠ করা হয় এবং এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে লেখা স্মারকলিপি পাঠ করে শোনান সংগঠনের সম্পাদক অমল মাইতি।

স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, সি ই এস সি সহ পশ্চিমবঙ্গের সব ক'টি বিদ্যুৎ সংস্থার পরিচালনায় দুর্নীতি, অপচয়, মাথাভারী প্রশাসন সহ সর্বস্তরে স্বচ্ছতা আনার জন্য রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন উপযুক্ত ভূমিকা নিলে বিদ্যুতের মাশুল অনেক কমে যেত। বিদ্যুৎ আইনের ৬২(৩) ধারাকে জনস্বার্থে প্রয়োগ করলে অন্যান্য রাজ্যের মতো এ রাজ্যের কৃষকদের অনায়াসেই ৫০ পয়সা ইউনিটে বিদ্যুৎ দেওয়া যায়। সাধারণ গৃহস্থ, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও ক্ষুদ্র শিল্পে দেওয়া যায়, ১ টাকা ইউনিটে। কিন্তু রাজ্য সরকারের চাপে রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন তা করেনি। ফলে সাধারণ গ্রাহকদের বাড়তি মাশুল গুণতে হচ্ছে।

স্মারকলিপিতে আরও বলা হয়েছে, আন্দোলনের চাপে সি ই এস সি'র ক্ষেত্রে ইউনিট প্রতি ৭ পয়সা এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ক্ষেত্রে ইউনিট প্রতি ৮ পয়সা কমেছে। এর ফলে সাকুল্যে ১৩৪ কোটি টাকা মাশুল কমলেও পারস্পরিক ভর্তুকি বিলোপনীতির জন্য এর সুফল চলে যায় গুটিকয়েক শিল্পমালিকদের পকেটে। তাদের কমে ১১৭ কোটি টাকা, আর সাধারণ গ্রাহকদের কমে মাত্র ১৭ কোটি টাকা। এই ঘটনা আবারও দেখিয়ে দেয় বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থায় বুর্জোয়াদেরই স্বার্থ ষোলআনা সুরক্ষিত, আর সাধারণ মানুষকে বইতে হয় সঙ্কটের বোঝা। এই চূড়ান্ত জনবিরোধী সরকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, পানীয় জল সরবরাহ, রাস্তার আলো প্রভৃতির উপর মাশুল বৃদ্ধি করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি। কোন সভ্য গণতান্ত্রিক সরকার এটা করতে পারে না। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ নীতিতে ঘোষণা করা হয়েছে, মাসিক ৩০ ইউনিট পর্যন্ত গ্রাহকদের মাশুলে ৫০ শতাংশ ছাড় দেওয়ার। এ রাজ্যের সরকার তাও দিচ্ছে না। উপরন্তু বিদ্যুৎ পর্ষদে ক্ষুদ্র শিল্পের গ্রাহকদের ফিক্সড চার্জ ও মিটার ভাড়া বৃদ্ধি করে মাসে প্রায় ১০০ টাকা মাশুল বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এই সর্বাত্মক আক্রমণের প্রতিবাদেই রাজ্যের বিদ্যুৎ গ্রাহকেরা কলেজ স্কোয়ারে সমবেত হয়েছিলেন। তাঁদের দাবি — হয় বিদ্যুৎ আইনের ১০৮ নং ধারা প্রয়োগ করে ঘোষিত মাশুল বাতিল করতে হবে, না হয় রাজ্য সরকারকে ১০০০ কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হবে; কৃষি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের তিন একর পর্যন্ত বিনা পয়সায়, বাকিদের ৫০ পয়সা ইউনিটে বিদ্যুৎ দিতে হবে; গৃহস্থ, ক্ষুদ্র শিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের এক টাকা ইউনিটে বিদ্যুৎ দিতে হবে; ক্ষুদ্রশিল্পের গ্রাহকদের ফিক্সড্ চার্জ এবং মিটারভাড়া ৪৫ টাকা করতে হবে; ডিজেল পাম্পের চাষীদের জন্য ৫০ শতাংশ কম দামে ডিজেল সরবরাহের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে; পুলিশের গুলিতে আহত খোদ্দার সেখের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি সরকারকে কার্যকর করতে হবে। এই দাবিতে মিছিল ধর্মতলায় এলে পুলিশ জানায় মুখ্যমন্ত্রী ব্যস্ত থাকায় প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারবেন না। একথা শুনে বিদ্যুৎগ্রাহকরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। পরে মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে জয়েন্ট সেক্রেটারি স্মারকলিপি গ্রহণ করে আলোচনায় বসতে রাজি হলে সংগঠনের সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাস ও সম্পাদক অমল মাইতির নেতৃত্বে ৫ জনের প্রতিনিধি দল আলোচনায় অংশ নেন। জয়েন্ট সেক্রেটারি শীঘ্রই মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য জানানোর প্রতিশ্রুতি দেন। দাবি মানতে সরকারি অনড় মনোভাব ও ঔদ্ধত্যের প্রতিবাদে দুই সহস্রাধিক কৃষক আইনঅমান্য করে কারাবরণ করেন।

২৯ জুন সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির (অ্যাবেকা) ডাকে মহাকরণ অভিযান। ডানদিকে মিছিলের সামনে নেতৃবৃন্দ।

ফি-বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনের জয়

জলপাইগুড়ি জেলার ফালাকাটা ব্লকের পলাশবাড়ী শীলবাড়ীঘাট উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির সময় ৫০০ টাকা ফি নেওয়ার প্রতিবাদে ১২ জুন ডি এস ও'র নেতৃত্বে প্রায় শতাধিক ছাত্রছাত্রী মিছিল করে প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে স্মারকলিপি প্রদান করে। প্রধান শিক্ষক ও স্কুল কর্তৃপক্ষ সদর্থক কোন ভূমিকা গ্রহণ না করায় ছাত্রছাত্রীরা ১৪ জুন প্রধান শিক্ষককে ঘেরাও করে। সিপিএম নেতৃত্ব ও স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের প্রকাশ্যে হুমকি দিতে থাকে, কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা ডি এস ও'র আন্দোলনে অবিচল ছিল। অবশেষে স্কুল কর্তৃপক্ষ ফি কমিয়ে ৩১১ টাকা ও ৩৫৬ টাকায় ছাত্র ভর্তি করাতে বাধ্য হয়। ডিএসও'র নেতৃত্বে আন্দোলনে এলাকার ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ফলেই এই জয় সম্ভব হয়েছে। এই জয়ের পর ছাত্রছাত্রীরা পলাশবাড়ী বাজারে মিছিল ও পথসভা করে। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্যকমিটির সদস্য ও কোচবিহার জেলা সভাপতি কমরেড প্রদীপ রায় ও রাজ্যকমিটির সদস্যা ও কোচবিহার জেলা সহসভানেত্রী কমরেড কাকলি মহন্ত। বক্তারা বলেন, ভয়াবহ ফি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ছাত্রআন্দোলন জোরদার করা আজ অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

বিলগ্নীকরণ

৩০ জুন প্রতিবাদ দিবসে কলকাতায় শ্রমিক বিক্ষোভ

অত্যন্ত লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ন্যাশনাল অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি এবং নেভেলি লিগামেন্ট কর্পোরেশনের ১০ শতাংশ ও ন্যাশনাল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের ১৫ শতাংশ বিলগ্নীকরণের যে শ্রমস্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্ত সিপিএম নির্ভর কেন্দ্রীয় ইউ পি এ সরকার গ্রহণ করেছে, তার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের আহ্বানে ৩০ জুন সর্বভারতীয় প্রতিবাদ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয়।

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে পুরুলিয়া কোল ওয়াশারি থেকে শুরু করে গার্ডেনরিচের শিল্পাঞ্চল সর্বত্র নানা কর্মসূচির মাধ্যমে ৩০ জুন প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয়। কলকাতার ধর্মতলায় লেনিন মূর্তির পাদদেশে বিভিন্ন কারখানা ও অফিসের শ্রমিক-কর্মচারীরা বিকাল ৫টায় সমবেত হয়ে অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরমের কুশপুত্তলিকা দাহ করেন। কুশপুত্তলিকায় অগ্নিসংযোগ করেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য। সভায় কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড শান্তি ঘোষ সিপিএমের সমর্থনে টিকে থাকা ইউপিএ সরকারের শ্রমস্বার্থবিরোধী কালা সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে প্রতিটি কলে-কারখানায় দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

বস্তিবাসীদের উপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস

ছয়ের পাতার পর

নামে অধিগ্রহণ করতে পারবে। এই 'স্পেশাল পাবলিক প্রজেক্ট' বলতে ঠিক কী বোঝানো হয়েছে, তার কোনও সঠিক সংজ্ঞাও এই বিলে দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ এই আইনের বলে কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লির কোনও এলাকাকে অধিগ্রহণ করলে মুহূর্তের মধ্যে সেখানে বসবাসকারী সমস্ত মানুষই অবৈধ দখলদারে পরিণত হবেন। এরপর তো কেবল উচ্ছেদের অপেক্ষা।

ভারতের সংবিধানের ২১নং ধারায় নাগরিকদের জন্য যে 'জীবনের অধিকার' দেওয়া আছে, সেই অধিকারের মধ্যেই পড়ে আশ্রয়, বস্ত্র, জল, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজন ও সুযোগসুবিধাগুলি পাওয়া। কিন্তু এগুলি কার্যকর করার কোন ব্যবস্থাই না থাকার ফলে 'জীবনের অধিকার' কেবল সংবিধানের পাতাতেই সীমাবদ্ধ। দিল্লি ও মুম্বইয়ে মানুষ চলে আসে, কারণ নিজেদের গ্রামে এদের কিছুই নেই — চাকরি নেই, টাকা নেই, জমিও নেই, খাদ্যও নেই। সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় শহরে এসে তাদের সামনে বিকল্প আর কী আছে? সব জমিই হয় কোনও বেসরকারি মালিকের, না হয় সরকারের দখলে। ফুটপাত ও ঝুপড়ি বস্তিতে মানুষ শখ করে বা আনন্দের জন্য থাকে না। তারা এভাবে বাস করতে বাধ্য হয়, কারণ তাদের আশ্রয় ও খাদ্য দেওয়ার দায়িত্ব সরকার পালন করে না। এই অবস্থায় বস্তি উচ্ছেদকে কোন্ যুক্তিতে আইনসম্মত বলা যায়? না, কোনও যুক্তি দেওয়ার প্রয়োজন নেই পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও তার ম্যানেজার সরকার-গুলোর, তাদের আছে পুলিশ-প্রশাসন ও মিলিটারির শক্তি, আদালতের শক্তি, মিডিয়ার শক্তি। এর জোরেই তারা বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয় গরিবের ক্ষুদ্র আশ্রয়। এই হচ্ছে পুঁজিবাদী সভ্যতার, বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি ব্যবস্থায় 'নাগরিক স্বাধীনতার' অপার মহিমা! এমন বর্বর পরিকল্পনাকেই 'উন্নয়ন' বলে দেখিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দাসত্ব করাই এখন কংগ্রেস-বিজেপি থেকে সিপিএম পর্যন্ত সরকারি দলগুলির অলিখিত 'কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম' বা ন্যূনতম অভিন্ন কর্মসূচি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

রক্ত দেব, প্রাণ দেব, জমি দেব না

একের পাতার পর

বাজেমেলিয়া বারোয়ারিতলা, খাসেরভেড়ি, শিবতলা প্রাঙ্গণ ও বেড়াবেড়ি পূর্বপাড়ায় শক্তিসংঘের প্রাঙ্গণে বেলা ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি সভাতেই দুপুরের তীব্র রোদ এবং সন্ধ্যার ভ্যাপসা গরম উপেক্ষা করে শতশত কৃষক, খেতমজুর, কৃষক রমণীরা শুধু উপস্থিত ছিলেন তাই নয়, তাঁরা হৃদয় মথিত করে কান্নাভেজা গলায় তাঁদের সমস্যার কথা, বিপদের কথা তুলে ধরেন। ছয়টি সভায় প্রায় ৬০ জন কিষাণ-কিষাণী বক্তব্য রাখেন। আরও অনেকে সময়ের অভাবে তাঁদের ব্যথার কথা বলতে পারেননি। প্রতিটি সভাতেই কৃষকরা উদাত্ত কণ্ঠে স্লোগান তোলেন —'জমি নিয়ে মিথ্যাচার করছ কার স্বার্থে বামফ্রন্ট সরকার জবাব দাও', 'গুলি খাব, বুকের রক্ত দেব, তবু জমি দেব না', 'অবিলম্বে সিঙ্গুরের সোনার জমিতে কারখানা করার সিদ্ধান্ত বাতিল কর', গোপালনগর গ্রামের চাষী বাসুদেব ঘোষ বলেন — ''বামফ্রন্ট বলে, 'কৃষি আমাদের ভিত্তি আর শিল্প হল ভবিষ্যৎ'। ওরা কৃষি ও কৃষক মেরে যদি ভিত্তিই নষ্ট করে দেয়, তাহলে ভবিষ্যৎ থাকবে কী করে?'' ওই গ্রামেরই কৃষক রমণী তপতী থান্বীর বলেন, ''জমি চলে গেলে আমার ছেলেমেয়েরা শুকিয়ে মারা যাবে। তাই আমরা রক্ত দেব, তবু জমি দেব না''। কে জি ডি অঞ্চলের প্রধান হারাধন বাগ বলেন, ''আন্দোলনের যতরকম পর্যায় আছে, সবরকম আমরা করব, তবু জমি দেব না''। কৃষক রমণী মাধবী মৈত্র, লক্ষ্মী সাঁতরারা বললেন, ''জমি নিতে এলে রক্ত দেব, দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকবে জমি ছাড়ব না''। কৃষক রমণী সন্ধ্যা দাস কান্নারুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, ''যেদিন থেকে শুনেছি আমাদের জমি নিয়ে নেবে, চিন্তায় রাতে ভাল করে ঘুমোতে পারছি না। ওরা আমাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। ওরা গুলি করতে এলে আমরা গুলি খাব। জমি চলে গেলে তো আমরা ছেলেমেয়েদের খেতে দিতেই পারব না, তাহলে আর বেঁচে থেকে লাভ কী ? আসুন আমরা সবাই লড়াইয়ের ময়দানে মরি''। তিনি সকলের উদ্দেশে বলেন, ''আপনারা রাজি লড়তে ?'' শত শত কৃষক ও কৃষক রমণী সমবেত কণ্ঠে বলেন, ''আমরা রাজি''। কৃষক অষ্টু দে বলেন, ''সিপিএম অপপ্রচার চালিয়ে বলছে, এখানে নাকি লক্ষ্মীপুজোর ধান হয় না, ডিপ টিউবওয়েল, মিনি ডিপটিউবওয়েলগুলিতে জল ওঠে না। তাহলে জমি নিয়ে তারা ন্যায্য দাম দেবে বা চাকরির প্রতিশ্রুতি তারা রক্ষা করবে, এটা কেমন করে বিশ্বাস করব ?'' এরপর বর্ষীয়ান কৃষক জয়দেব দাস তাঁদের বিপদের কথা বলতে গিয়ে বিধায়ক দেবপ্রসাদ সরকারের বুকে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন। খাসেরভেড়ি গ্রামের রমণী অঞ্জুবালা মালিক বলেন, ''দালালরা আমাদের পিছনে লেগেছে, দালালদের গ্রামে ঢুকতে দিও না। ওরা আমাদের জমি কাড়তে এলে আমরা মাঠে বুকের রক্ত ঢেলে দেব''। বেড়াবেড়ি পূর্বপাড়া গ্রামের চাষী, কৃষিজমি রক্ষা কমিটির নেতা মানিক দাস বলেন, ''আমরা দলমতনির্বিশেষে সকল চাষী এক হয়েছি। জমি আমাদের মা, আমাদের মা-মাটিকে ওরা হরণ করতে আসছে। তাই আমরা রক্ত দেব, প্রাণ দেব, তবু মাকে হরণ করতে দেব না।'' বর্ষীয়ান কৃষক কাশীনাথ মান্না অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, ''বাপ-ঠাকুর্দারা জমি থেকে আমাদের মানুষ করেছে, আমরাও আমাদের সন্তানদের ও থেকেই মানুষ করেছি।'' তিনি মায়েদের উদ্দেশে বলেন, ''না, আর লজ্জা করলে চলবে না ; মাথার ঘোমটা খুলে শক্ত করে কোমরে কাপড় বেঁধে নামতে হবে''। অষ্টুরাণী কোলে বলেন, ''আমার জমি নেই, কিন্তু পাঁচটা গরু-ছাগল পুষে জমিতে দিনমজুরি খেটে খাই। জমি চলে গেলে আমার গোরু-ছাগল খাবে কী, আর আমিই বা কী কাজ করব ? তাই আমিও এই আন্দোলনের প্রতিটি কর্মসূচিতে আছি এবং থাকব''।

প্রতিটি সভাতেই কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার ও কৃষক আন্দোলনের নেতা কমরেড খোদাবক্স বক্তব্য রাখেন। কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার বলেন, ''আপনাদের লড়াইয়ের কথা ইতিমধ্যেই আমি বিধানসভায় তুলে ধরেছি। আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, আমি ও আমার দল এস ইউ সি আই আপনাদের লড়াইয়ের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত সঙ্গে থাকব এবং আপনাদের কথা নিয়ে বিধানসভায় প্রতিবাদ সংগঠিত করব''। তিনি আরও বলেন, ''সরকার তিনফসলি-চারফসলি জমি টাটাকে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে, যেখানে চাষের সমস্ত ব্যবস্থা, সেচের উপায় আছে। এর বিরুদ্ধে আপনারা সমবেতভাবে লড়ছেন এবং রক্ত দিতে, প্রাণ দিতে সংকল্প গ্রহণ করেছেন। সেজন্য আপনাদের আন্তরিক অভিবাদন জানাচ্ছি। এই আন্দোলনেও যে রাজনীতি নেই, তা নয়। এখানে আছে দু'টি রাজনীতি — একটা শোষিত মানুষের রাজনীতি, আর একটা শোষকের রাজনীতি। এই সরকার, গরিবের সরকার নয়। এরা আজ পুঁজিপতিদের সরকার, বড়লোকের সরকার। পশ্চিমবাংলায় ওরা কৃষক উচ্ছেদ অভিযানে নেমেছে, ফলে সর্বত্র কৃষকরা বিক্ষোভে আন্দোলনে ফেটে পড়ছে। আপনাদের আন্দোলনকে ওইসব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। তাহলে জয় আপনাদের নিশ্চয় হবে''। তিনি বলেন, ''আন্দোলনে জয় হয় যদি নেতৃত্ব সঠিক হয়। গত বছর কৃষিবিদ্যুতের দামবৃদ্ধির বিরুদ্ধে চাষীদের আন্দোলনের জয় হয়েছে।'' তিনি আরও বলেন, ''ওরা আজ জমি নিয়ে ব্যবসায় নেমেছে। আপনার সোনার জমি নিয়ে নামমাত্র কারখানা করে বাকি জমিতে আবাসন শিল্প গড়ে তুলে ওরা কোটি কোটি টাকা কামাবে। ফলে আপনারা এই লড়াই দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য হাজার হাজার কৃষক, যুবক, মহিলাদের ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তুলুন, জয় আপনাদের হবেই। কারণ ইতিহাসে এই শিক্ষাই আছে, জনগণ শেষ কথা বলে, অত্যাচারী শাসক শেষ কথা বলে না।''

কৃষক নেতা কমরেড সেখ খোদাবক্স বলেন, ''জমির ব্যবসা আজ একটা লাভজনক ব্যবসা। তাই কৃষক যাতে 'স্বেচ্ছায়' জমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় সেজন্য ওরা গভীর ষড়যন্ত্র করছে, জমির খাজনা বাড়াচ্ছে ; সার, খোল, বীজের দাম বাড়াচ্ছে, অথচ কৃষকের ফসলের দাম কমাচ্ছে। ওরা আবাসন শিল্প গড়বে, সেখানে বাড়ির কাজের মেয়ে দরকার, তারা আসবে কোথা থেকে ? চাষীর হাতে জমি থাকলে তার ঘরের মেয়ে লোকের বাড়ি কাজ করতে যাবে না। তাই চাষীর জমি কেড়ে নাও। এই ষড়যন্ত্র আপনাদের রুখতে হবে। সেজন্য যে ভলান্টিয়ার বাহিনী আপনারা ইতিমধ্যে গড়ে তুলেছেন, তারাই হবে এই আন্দোলনের জয়ের হাতিয়ার''।

কৃষিজমি রক্ষা কমিটির সভাপতি স্থানীয় বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন, ''একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এই প্রতিনিধিদল আমাদের মধ্যে এসে একটি বদ্ধঘরের মধ্যে যেন মুক্ত বায়ু এনে দিলেন। আমরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আমাদের বাড়ির চালে আজ আগুন ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে। সে আগুন আমাদের নেভাতে হবে। প্রশাসনের লাঠি-গুলির মোকাবিলা আমাদের করতে হবে। মানুষের দৃঢ়তাই আসল শক্তি। তাই জয় আমাদের হবেই''। এছাড়া বক্তব্য রাখেন কৃষিজমি রক্ষা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক শঙ্কর জানা।

আলোকশিল্পী তাপস সেনের মৃত্যুতে কমরেড নীহার মুখার্জীর শোকবার্তা

প্রখ্যাত আলোকশিল্পী বামপন্থী মনোভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবী শ্রী তাপস সেনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে এবং এস ইউ সি আই প্রতিষ্ঠাপর্বে তাঁর উল্লেখযোগ্য সক্রিয় সাহচর্য স্মরণ করে এস ইউ সি আই-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ২৯ জুন এক শোকবার্তায় বলেছেন, শ্রী তাপস সেনের মৃত্যুতে দেশের প্রগতিশীল শিল্প এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলন একজন নিষ্ঠাবান পুরোধাকে হারাল। শোকবার্তায় কমরেড মুখার্জী শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

এদিন সকালে কলকাতায় রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণে শায়িত তাপস সেনের মরদেহে কমরেড নীহার মুখার্জীর পক্ষে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী।

রাস্তায় গণদাবী বিক্রি করেছি

''...আমি অ্যাকটিভলি একটা বামপন্থী দলের সঙ্গে যুক্ত হই এমনকী কিছুদিনের জন্য পার্টির হোলটাইমারও হয়েছিলাম। হ্যাঁ, এস ইউ সি মানে সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টারের সদস্য ছিলাম আমি। পোস্টার মেরেছি রাস্তায়। শিয়ালদা থেকে হাওড়া — পুরো হ্যারিসন রোড; শ্যামবাজার থেকে ওয়েলিংটন স্কোয়ার, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, আশুতোষ মুখার্জী রোডে রাতের পর রাত জেগে পোস্টার মেরেছি; 'গণদাবী' কাগজ বিক্রি করেছি গড়িয়াহাটে, হাজরা মোড়ে; হাটেবাজারে কৌটোয় করে পয়সা তুলেছি। তখন যে কাজটাই করতাম, তা করতাম অত্যন্ত জেদের সঙ্গে। কাগজ বিক্রি করলে সবার চেয়ে বেশি বিক্রি করব, পয়সা কালেকশন করলে সবার চেয়ে বেশি পয়সা তুলব।''

— তাপস সেন

(আত্মজীবনী 'আলোছায়ার পথে' থেকে)

কৃষি জমি থেকে উচ্ছেদ প্রতিরোধে

সারা বাংলা কৃষক-খেতমজুর কনভেনশন

স্থান ঃ মৌলালী যুবকেন্দ্র, কলকাতা, ১২ জুলাই, বেলা ৩টা

আহ্বায়ক

শেখ খোদাবক্স সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী দাউদ গাজী

* কৃষিজমি বাঁচাও কমিটি, সিঙ্গুর, হুগলির পক্ষে

শঙ্কর জানা - যুগ্ম আহ্বায়ক, **কাশীনাথ কোলে, রাজকুমার ধাড়া, কর্ণ ঘোষ, সমীর দাশ, তাপস দাস, অষ্টুপদ বারিক**

* কৃষক উচ্ছেদ বিরোধী ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি, নন্দীগ্রাম, মেদিনীপুর-এর পক্ষে

প্রফুল্ল কুমার মাইতি - সভাপতি, **নন্দ পাত্র** - সম্পাদক

* কৃষি-কৃষক-খেতমজুর বাঁচাও কমিটি, কাটোয়া, বর্ধমান-এর পক্ষে

ধর্মদাস ঘোষ - সভাপতি, **রবীন্দ্রনাথ রায়** - সম্পাদক, **তপন ঘোষ** - সহ সম্পাদক

মোকলেসুর রহমান - সদস্য, **কালীচরণ সরদার** - সদস্য

* কৃষক বাঁচাও কমিটি, বাগদা, উত্তর ২৪ পরগণার পক্ষে

পরিতোষ অধিকারী, শঙ্কর মল্লিক, প্রফুল্ল মণ্ডল

* কড়াইডাঙ্গা ভাটিপোতা গঙ্গাপুর জমি রক্ষা কমিটি, ভাঙ্গড়, দক্ষিণ ২৪ পরগণার পক্ষে

জলিল ঢালী, সঞ্জয় পাত্র, বাদল মণ্ডল, শ্রীপদ মণ্ডল

* কৃষি ও বাস্তুজমি উচ্ছেদ বিরোধী সংগ্রাম কমিটি, ফুলবাড়ী, জলপাইগুড়ি

মুর্শেদ আলি - সম্পাদক

দাউদ আলি - শিক্ষক, খড়ম্বা হাইস্কুল, ভাঙ্গড়, দক্ষিণ ২৪পরগণা

আয়ুব আলি মণ্ডল - হরিণঘাটা, নদীয়া

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩২৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in